শুকতারা

৬৭

নবম সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৪২১
১৫.০০

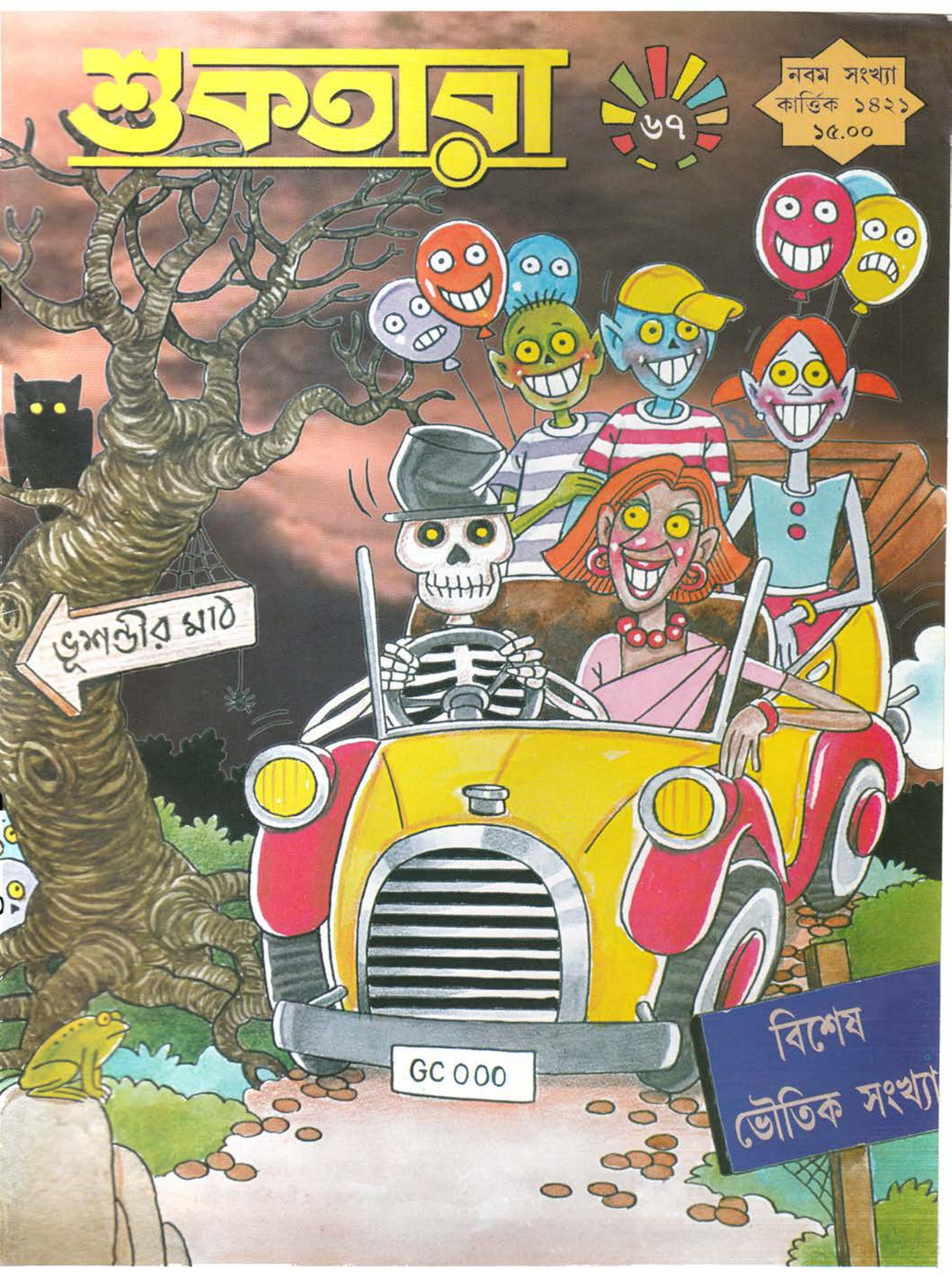

সবচেয়ে বেশি লাল,
সবচেয়ে বেশি ঝাল...
দেশী রান্নায় আসল ঝাল লঙ্কা চাই-ই চাই। ঠিক যেমন আজকের সিনেমায় চাই আইটেম সং। আমার কিচেনের আইটেম সং হলো শালিমার শেফ চিলি। আমি শুধু ভরসা করি বাছাই ক্ষেত থেকে আনা লঙ্কার ওপর। যা থেকে শালিমার শেফ চিলি তৈরি হয় কড়া যাচাইয়ের পরে, শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাই যখনই চাই আইটেম সং-এর জোর হুল্লোড়, তখন শালিমার শেফ চিলি এক নম্বর।
Shalimar's
CHEF
AGMARK
Red Chilli Powder
Turmeric Powder
100% Vegetarian
শালিমার®
CHEF
★ ★ শেফ্ গুঁড়ো মশলা ★ ★
• লঙ্কা • হলুদ • জিরে • ধনে • গরম মশলা
• সব্জি মশলা • চিকেন মশলা • মিট্ মশলা
শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, ৯২-ই আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭

বাঁটুল দি গ্রেট

নারায়ণ দেবনাথ

তাহলে কি হবে গো, কোবরেজ মশাই?
ওঁকে রক্ত দিতে হবে, তাগড়াই মানুষের তাজা রক্ত, তাহলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন গুরুদেব।
গুরুদেবের জীবন বাঁচাতে তাগড়াই মানুষের খোঁজে বেরোতে হবে।
দাঁড়াও। এরকম কেউ একজন এদিকেই আসছে।
একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। বাচ্চু দুটো সঙ্গে আসেনি। তাতে ভালোই হয়েছে। এই বিশাল মাঠ পেরোতে হতো। আরে, ওখানে কি?
কিছুটা এগোতেই -
আমি এখান দিয়ে কাজে যাচ্ছিলুম
আর তোমরা ধরে নিয়ে এলে। কেন?
আমাদের গুরুদেব তোমার ঘাড় মটকে রক্ত খাবেন বলে।
কোবরেজ বলেছে তাজা রক্ত খেতে। তাহলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাই একজনকে এনেছি। ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে নিন।
কে, দে।
অ্যাঁক! রক্ত খাবার জন্যে কাকে ধরে এনেছিস? যেটুকু বেঁচে আছি, ওর রক্ত খেতে গেলে তাও থাকবো না।
ওরে তোরা বাঁচতে চাস তো এই তল্লাট ছেড়ে পালা! ওর হাতে পড়লে তোদের ভূতের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে।
কিসে কি হলো কিছুই বুঝলাম না।

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কেনার সময় অবশ্যই

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড

নাম দেখে তবেই কিনবেন

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007

email : dutaspice@gmail.com

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

শুকতারা

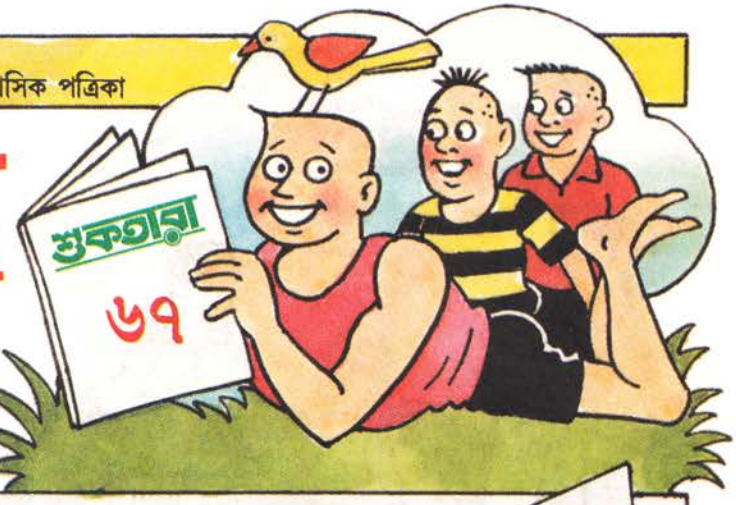

নবম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৪২১, অক্টোবর ২০১৪

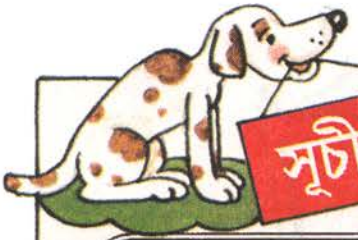

সূচীপত্র

কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হলেন সগুণ ঈশ্বর। সমষ্টির ইচ্ছাকে কেউ রোধ করতে পারে না। নিয়ম বলতে আমরা যা বুঝি তা এই। একেই আমরা শিব, কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা

আরও গল্প

দুঃখীরাম-শান্তিরাম—মণিলাল মুখোপাধ্যায় ১৪
ওরা আছে—তারক ঘোষ ২৩
ভৌতিক সম্মেলনে অষ্টদা—পীযূষকান্তি সরকার ৪৪
দীনবন্ধু আর বাদার জঙ্গলে যায় না—শিশির বিশ্বাস ৫৭
হাড়কাঁপানো শীতের রাতে—তরুণ কুমার সরখেল ৬২

পুরস্কৃত গল্প

প্রেম-গোবিন্দ (প্রথম)
—সুকন্যা দে ৪৭
আনন্দ নিকেতন (দ্বিতীয়)—মানিকলাল মজুমদার ৪৯
কোথা ছাড়ি খুঁজিছ ঈশ্বর (তৃতীয়)—প্রার্থনা পাঠক ৫১

ফিচার

কুইজ কুইজ (৪ রং) ৬৭

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭
উঠছে যারা—বীরু বসু ৪২
সুস্থ থাকতে হলে—তুষার শীল ৪৩

ম্যাজিক (৪ রং)

জাদুকরের হাতে রয়েছে জলভর্তি পাত্র। একজন দর্শক এসে তাঁর হাত পাত্রে ডোবাতেই হাত ভিজে গেল। পরমুহূর্তে জাদুকর কিছু মন্ত্রপূত ছাই ছড়িয়ে দিলেন জলে। পরের দর্শক এতে হাত ডোবাতেই আশ্চর্য কাণ্ড। তাঁর হাত ভিজল না। কেমন করে? জানতে অবশ্যই পড়তে হবে জাদুকর পি. সি. সরকার, জুনিয়রের লেখা চিটিং ফাঁক....৬৮

ফিরে দেখা

চোখ জুড়ে আসার মুখে শুয়ে শুয়ে দাদু, দিদিমা ও লেনার কথা গভীরভাবে মনে পড়তেই হানস্ হঠাৎ দেখল লেনা তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে উঠে হানস্ হাত বাড়াল কিন্তু—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের লেখা গল্প মরা বোন ও ভুতুড়ে পাইন...২০

ধারাবাহিক

কলকাতার নামকরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল পড়া ছেলে পিকলু। সে চলেছে তার বাবার সঙ্গে বীরভূমের এক গণ্ডগ্রামে। সেখানে তার দাদুর বাড়ি। বাবার ছেলেবেলাকার স্মৃতি ছড়ানো সেখানে। কিন্তু পিকলু বাড়িটাকে তার নিজের বলে ভাবতে পারে না। তার মুখে 'তোমাদের বাড়ি' শুনে আহত হন সৌমেন্দু। ডাঃ প্রকাশরঞ্জন দাশের নতুন ধারাবাহিক আমার বাড়ি....৩০

কবিতা ও ছড়া

নয় মোটে ভূত ওরা (৪ রং)
—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৮
ভূতুড়ে ছড়া—অজয় লস্কর ৫৫
ভূতের ভয়—অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫
ভূতের মতন—দীপ মুখোপাধ্যায় ৫৫

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ৫৪
মনের জানলা—জগদিন্দ্র মণ্ডল ৫৬
আমরা বলছি ২৭
দাদুমণির চিঠি ১৯
তোমাদের পাতা (৪ রং) ৭১
মজার পাতা ৬৪

ছবিতে গল্প (৪ রং)

বাঁটুল দি গ্রেট—নারায়ণ দেবনাথ ৩
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৭৩
বিচ্ছুর জাদুশক্তি—জুরান নাথ ৩৫

ঘোষণা

কানাইলাল গুছাইত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫৩
জানো কী! ৫২

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

ফিচার

একানাগাড়ে বসে কাজ করলে শরীরে চর্বি সঞ্চয় বাড়ে...ছোটরা খেলতে খেলতে বিভিন্ন বিষয়ে কী করে শিখতে পারে...এবং সজারু মানুষ দেখলেই সত্যি সত্যি কাঁটা ছোড়ে কিনা—এসব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সন্দীপ সেন তাঁর এবারের **বিজ্ঞানের খবর-এ...৬১**

গল্প (৪ রং)

আবার সেই এক কাণ্ড। আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না পলাশ। তবে আজকের অনুভূতিটা আগের দিনের চেয়েও আরও স্পষ্ট। খুব নিঃসাড়ে যেন একটা খসখস শব্দ হচ্ছে—আবেশ কুমার দাসের লেখা ভৌতিক গল্প **ক্যালেন্ডার....৯**

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

সম্পাদক ঃ অরুণ চন্দ্র মজুমদার

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে এক বছরের জন্যে ১৭০ টাকা।

বুকপোস্টে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ২০০ টাকা। রেজিস্ট্রি ডাকে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA-By Air Mail **Rs. 1700.00**

R.N.I Registration No. 2621

দেব সাহিত্য কুটীর

পরিবেশিত

ই-মেল ঃ dev_sahitya@rediffmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, শুকতারা (বিভাগের নাম), ২২/৪ সি, ঝামাপুকুর লেন, কল ৭০০ ০০৯

যোগাযোগের সময়—(সোম থেকে শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

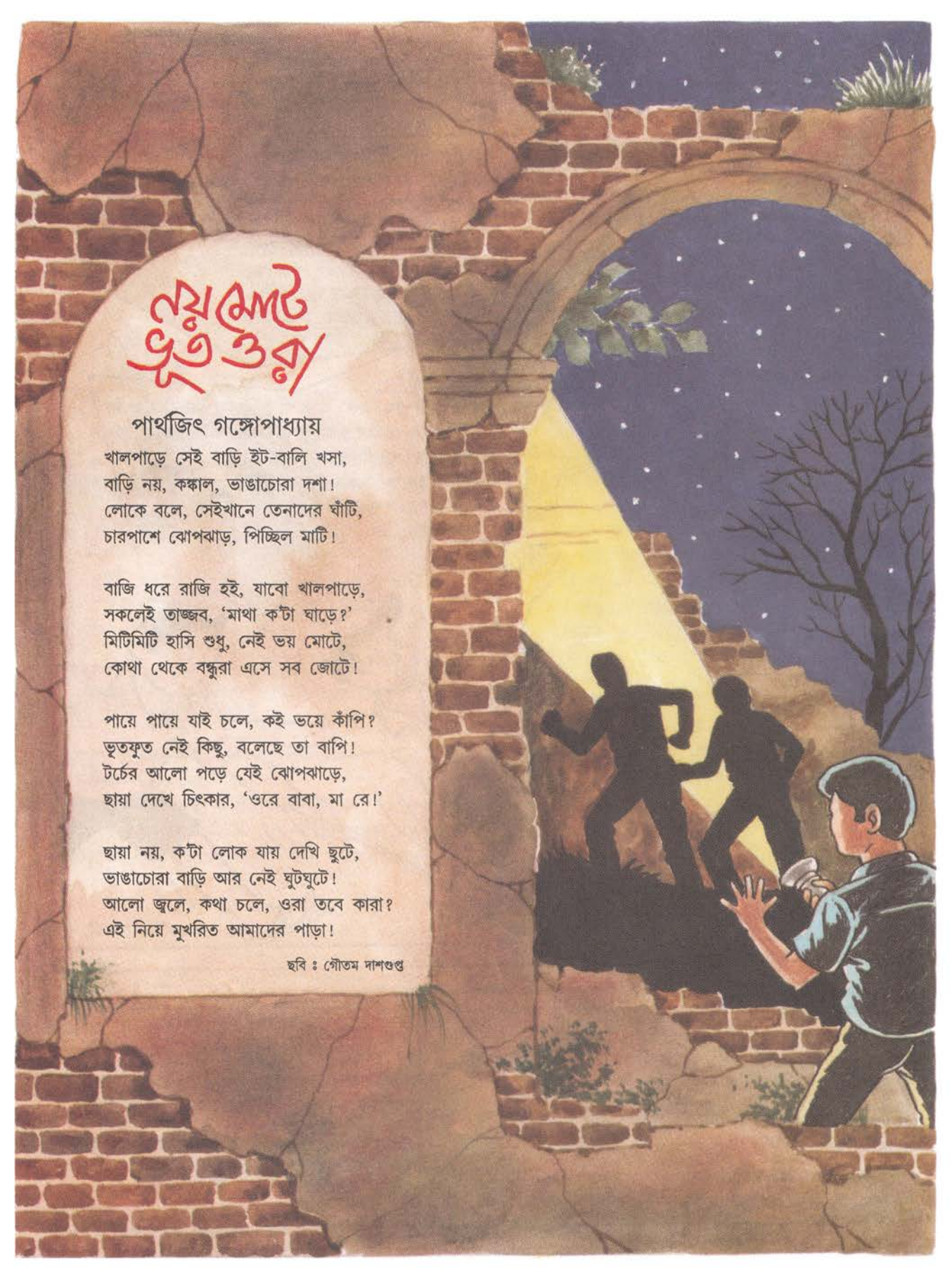

নয় মোটে ভূত ওরা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

খালপাড়ে সেই বাড়ি ইট-বালি খসা,
বাড়ি নয়, কঙ্কাল, ভাঙাচোরা দশা!
লোকে বলে, সেইখানে তেনাদের ঘাঁটি,
চারপাশে ঝোপঝাড়, পিচ্ছিল মাটি!

বাজি ধরে রাজি হই, যাবো খালপাড়ে,
সকলেই তাজ্জব, 'মাথা ক'টা ঘাড়ে?'
মিটিমিটি হাসি শুধু, নেই ভয় মোটে,
কোথা থেকে বন্ধুরা এসে সব জোটে!

পায়ে পায়ে যাই চলে, কই ভয়ে কাঁপি?
ভূতফুত নেই কিছু, বলেছে তা বাপি!
টর্চের আলো পড়ে যেই ঝোপঝাড়ে,
ছায়া দেখে চিৎকার, 'ওরে বাবা, মা রে!'

ছায়া নয়, ক'টা লোক যায় দেখি ছুটে,
ভাঙাচোরা বাড়ি আর নেই ঘুটঘুটে!
আলো জ্বলে, কথা চলে, ওরা তবে কারা?
এই নিয়ে মুখরিত আমাদের পাড়া!

ছবি : গৌতম দাশগুপ্ত

আবেশ কুমার দাস

ক্যালেন্ডারখানার জন্যই না এবারে নতুন ঘর খুঁজতে হয় পলাশকে। পাঁচ বছর আগেকার ক্যালেন্ডার। বেডরুমের উত্তরের দেওয়ালে ঝুলছিল এতদিন ধরে।

তিন বছরে অনেক ভাড়াটে এসেছে গেছে এ বাড়িতে। বিজনবাবুর কাছেই শুনেছে পলাশ। কিন্তু শোওয়ার ঘরটার বদনাম তো করেনি কেউ। পাড়ার লোকের কাছে অন্তত শুনতে পেত তাহলে। আর তাছাড়া সন্দীপদাই কি এই বাড়ির খোঁজ দিত তেমন কোনও দোষ থাকলে?

বর্ধমান থেকে বদলি হয়ে এই মাস দেড়েক হল বেহালার অফিসে এসেছে পলাশ। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি। সারাটা দিন বাইক নিয়ে সারা শহরটাকে চষে বেড়াতে হয়। ভালো একখানা ঘরের খোঁজ করছিল কাছেপিঠে। অফিসের সন্দীপদা একদিন বলল, একটু ভেতরের দিকে একখানা ভালো বাড়ি আছে। দেখবে নাকি পলাশ?

ভেতরের দিক বলতে?

একদম বড়রাস্তার ওপর হবে না। বীরেন রায় রোড থেকে ভেতরে গিয়ে রামমোহন রায় রোডে গলির ভেতরে। তবে বাড়িখানা ভালো।

আচ্ছা গিয়ে তো দেখি। বাইক আছে। অসুবিধে কী গলির ভেতর হলে!

আমিও তাই বলি। আসলে বাড়ির মালিকের সঙ্গে আমার জানাশুনো আছে। আমাদের অফিসের আরও দু'জন থেকেছে তো এর আগে ওই বাড়িতে। তুমি দেখতে পার।

ঘর দেখে পছন্দই হয়ে গেল পলাশের। দক্ষিণখোলা বেডরুম। জানলার ওপাশে আবার একচিলতে বাগান। মালিক বিজনবাবুও সজ্জন লোক। ইউকো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের মুখে মুখে কম পয়সায় জমিটা কিনে তিন-তলা বাড়ি ফেঁদে বসেছেন। একমাত্র ছেলে কাজের সূত্রে ভুবনেশ্বরে। এত বড় বাড়ি তাই এখন স্রেফ শূন্যপুরী। বুড়ো-বুড়ি একতলাটা ভাড়ায়

আরেকখানা ক্যাডবেরি কিনে এনে দেয় বুবুনকে

বসিয়েছে। আগের ভাড়াটে ছেড়ে চলে যাওয়ায় গেল তিনমাস ফাঁকাই পড়ে ছিল ঘরগুলো। বেডরুম ধরে মোট দুটো ঘর, ড্রয়িংরুম, ডাইনিং, কিচেন আর টয়লেট নিয়ে গোটা একতলাটা স্রেফ জলের দরেই পেয়ে গেল পলাশ।

বিজনবাবু বললেন, ভাড়ার টাকাটা আমার বড় কথা নয়। আসলে একা থাকি আমরা। বয়েসও হয়েছে। বুঝতেই পার। বাড়িতে ভাড়াটে থাকলে তাও বিপদ-আপদের দিনে বুকে একটা বল পাওয়া যায়। ঘরগুলোর দেখভালও হয় মোটামুটি। তা তুমি কবে আসছ বল।

পরের দিনই জিনিসপত্র নিয়ে নতুন বাড়িতে চলে এল পলাশ। পাড়াটাও ভালো। গলির ভেতর বেশ শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ। আবার বাইকে ম্যানটন বাসস্ট্যান্ড মোটে মিনিট দশ- বারোর রাস্তা। সন্দীপদাকে ধন্যবাদ দিতে সেও হেসে বলল, ঠিক আছে। বাড়ি পছন্দ হবে জানতাম। তা সন্ধের দিকে মাঝেসাঝে চলে আসবে আমার বাড়ি। বেশি দূরও নয়।

ম্যানটনের কাছে বাড়ি সন্দীপদার। দু'দিন সন্ধের পর অফিসফেরতা ঘুরেও এল পলাশ তার বাড়ি থেকে।

ভালোই চলছিল সবদিক। কিন্তু গোল বাধতে শুরু করল হপ্তাখানেক যেতে না যেতেই।

দিনটা ছিল শনিবার। গুমোট গরম পড়েছে। দক্ষিণের জানলাখানা হাট করে খুলে দিয়েও ঘুম আসছিল না পলাশের। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। মশারির ভেতর ফ্যানের হাওয়া যেন গায়েই লাগে না। গরমটা পড়েছে বটে এবারে। তাও কপাল ভালো বাড়িতে ইনভার্টার আছে। নয়তো শোওয়ার সময় রোজ এমনি লোডশেডিং হতে থাকলে মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

ঘুম না এলে যেমনি হয়—শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল পলাশ। আচমকা যেন অন্যরকম একখানা অনুভূতি জেগে উঠল তার মনে। খালি মনে হতে লাগল ঘরে এই মুহূর্তে সে একা নয়। যেন আরও কেউ আছে। শুধু আছে নয় দিব্যি চলছে-ফিরছে- হাঁটছে সেই লোকটা। ইঁট-কাঠ-পাথরের নির্জীব ঘরেরও একখানা প্রাণস্পন্দন আছে। দিনের আলোয় বোঝা যায় না। কিন্তু এমনি রাতবিরেতে পান থেকে একটুখানি চুন খসলেই সজাগ হয়ে ওঠে সেই নিস্তরঙ্গ প্রাণেন্দ্রিয়। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে অজানা কোনও সংঘটনের আশঙ্কায়।

অন্ধকার ততক্ষণে বেশ চোখ-সওয়া। তাছাড়া গলির ভেতর লাইটপোস্টটা থেকে তেরচা হয়ে নিভু নিভু আলোর একটা হলদে দ্যুতি এসে পড়েছে দক্ষিণের জানলায়।

ঘরের ভেতর একটা আবছা আলো-অন্ধকারের পরিবেশ।

চোরটোর ঢোকেনি তো? কিন্তু ঢুকবেটা কোথা দিয়ে? কৌটোর মতো আঁটা চারপাশ। বিছানায় শুয়ে শুয়েই খুব সাবধানে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ রেখে ঘরের চারকোনাটুকু একবার দেখে নেয় পলাশ। আবছা আলো-আঁধারিতে অস্বাভাবিক কোনও কিছুই চোখে পড়ে না। মেদিনীপুরের গ্রামের ছেলে পলাশ। সাহসটা বরাবরই একটু বেশি। নিশ্চিন্ত হতে এবারে সে ঝট করে উঠে বসে বিছানায়। বালিশের পাশে রাখা টর্চটা জ্বেলে দেখে নেয় ঘরের আনাচ-কানাচ। একেবারে শুনশান সবদিক। বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামে। আলো ফেলে দেখে নেয় খাটের তলাটুকু। লাইট জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে আসে ড্রয়িংরুম থেকে টয়লেট সবখানে। কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই।

কিন্তু মশারির ভেতর আবার এসে ঢুকতেই যে কে সেই। কেউ আছেই শুধু নয় এবারে যেন সেই অনাহুত মানুষটার নিঃশ্বাসটুকুও টের পাচ্ছে পলাশ। জোর করে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে সে। দেড়টা বাজতে চলেছে। এত রাত অবধি ঘুম না এলে যা হয়—পেটে গ্যাস হয়ে গেছে নির্ঘাত। দুপুর রোদে গোলবাড়িতে তখন রুটি দিয়ে কষা কষা খাসির মাংসটা খাওয়া ঠিক হয়নি এত গরমে। আসলে খিদেও পেয়েছিল। কিন্তু সেটাই কাল হয়ে গিয়ে থাকবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। পরের দিন সকালে উঠে আর মনেও ছিল না ঘটনাটা। ক'টা দিন তারপর কেটে গেল বেশ নিরুত্তাপেই। ইতিমধ্যে একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কিনেছে পলাশ। হাই স্পিডের হাওয়ায় ঘুমটাও হচ্ছিল বেশ জমাটি।

উৎপাতটা আবার শুরু হল ঠিক এক হপ্তা পর। আবার সেই শনিবারের রাতে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিল পলাশ। রিষড়ার রাস্তায় হাওয়ার বেগে বাইক চালাচ্ছে সে। হাতে আর সময় নেই। মিনিট পাঁচেকের ভেতর পৌঁছতে হবে ডাক্তারের চেম্বারে। ডক্টর সুব্রত লাহা খুব সময়ানুবর্তী মানুষ। চারটের জায়গায় চারটে পাঁচ বাজলে আর দেখা করতে চান না। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল পলাশের। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে মনে পড়ল বছর চারেক আগে সে ছিল হিন্দমোটরে। তখন কাজেকর্মে বালি থেকে বৈদ্যবাটি প্রায়শই ঘুরতে হত। সত্যি মানুষ স্বপ্নের ভেতর কখন কোথায় যে গিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। কিন্তু ঘুমটা ভাঙল কেন এখন!

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই আবার মনে হল ঘরের ভেতর কেউ আছে। দিব্যি হাঁটছে ফিরছে সেই মানুষটা। নিঃশ্বাসও পড়ছে তার। আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না পলাশ। আবার সেই এক কাণ্ড। আবার পেটে গ্যাস হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। কিন্তু আজকের অনুভূতিটা যেন অনেক বেশি স্পষ্ট আগের দিনের তুলনায়। খুব নিঃসাড়ে যেন একটা খসখস শব্দ হচ্ছে মানুষটার হাঁটাচলার। কান পেতে শুনতে লাগল পলাশ। খসখসে একটা আওয়াজ হচ্ছে বটে ঘরের মধ্যে। ইঁদুরটিঁদুরও হতে পারে। কান পেতে থাকতে থাকতেই কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি।

কিন্তু পরের দিনই এমন অদ্ভুত একখানা ঘটনা ঘটল যে আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারল না পলাশ। সেদিন রোববার। দুপুরবেলা সন্দীপদা বৌদি আর বুবুনকে নিয়ে এসেছে তার বাড়িতে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়ে গেছে সন্দীপদার বাড়িতে। তাকেও একদিন নিজের বাড়িতে না ডাকলে খারাপ দেখায়। বুবুনের জন্য একটা ক্যাডবেরি কিনে রেখেছিল পলাশ। সন্দীপদারা এল সাড়ে এগারোটার দিকে। ক্যাডবেরি হাতে পেয়ে বুবুন তো মহা খুশি। নাচতে নাচতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে লাগল।

পলাশের সঙ্গে হাত লাগিয়ে মাংসটা রাঁধছিল বৌদি। পলাশ অবশ্য ভীষণ আপত্তি করেছিল প্রথমে, না না, সে কী কথা! আজ তোমরা হলে আমার গেস্ট। তুমি আমার বাড়িতে এসে খাটবে কেন?

কিন্তু বৌদি শুনলে তো।

ড্রয়িংরুমে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিল সন্দীপদা।

এমন সময় বুবুনের গলা শুনতে পেল পলাশ। কাঁদো কাঁদো স্বরে সে কোনও নালিশ জানাচ্ছে বাবাকে। প্রেশার কুকারের স্টিমের আওয়াজে কিচেন থেকে সব কথা শোনা যাচ্ছিল না। খালি ক্যাডবেরি শব্দটা কানে আসতে পলাশ বেরিয়ে এল ড্রয়িংরুমে।

পলাশকে দেখে সন্দীপদা বলে, দেখ তো পলাশ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ওর কথা। কোন বাচ্চা ছেলে নাকি ওর ক্যাডবেরি নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। ওই ঘরেই নাকি থাকে সে। এ বাড়িতে কোনও বাচ্চাকাচ্চা কেউ আছে নাকি?

নীরবে মাথা নাড়ে পলাশ।

আচ্ছা আর এটা একবার দেখ তো তুমি। ক্যাডবেরির প্যাকেটটা পলাশকে বাড়িয়ে দেয় সন্দীপদা।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে তাজ্জব হয়ে যায় পলাশ। বোঝা যাচ্ছে একেবারে ফাঁকা প্যাকেট। ভেতরে কিচ্ছু নেই। কিন্তু এতটুকু ছেঁড়া হয়নি কোথাও প্যাকেটখানাকে। একেবারে নিভাঁজ নিটোল। এতটুকু না ছিঁড়ে কেমন করে একটা মুখবন্ধ প্যাকেট থেকে একখানা আস্ত ক্যাডবেরি বের করে ফেলা যায় মাথায় ঢুকছিল না পলাশের। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে সন্দীপদার মুখের দিকে।

যেন তার মনের কথাটা ধরতে পেরেই সন্দীপদাও বলে ওঠে, আমিও বুঝতে পারছি না কিছুই।

ততক্ষণে বৌদিও কিচেনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারও চোখেমুখে জিজ্ঞাসু চাহনি। পলাশ

বলে, বৌদি তুমি মাংসটা একটু দেখ। আমি দেখছি এদিকে কী ব্যাপার। এস তো বুবুন আমার সঙ্গে।

পলাশের বেডরুমে এসে বুবুন আঙুল তুলে দেখায়, ওই ছেলেটা। ওই খেয়েছে আমার ক্যাডবেরি।

পলাশ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে দরজার ঠিক মাথায় বেডরুমের উত্তরের দেওয়ালে যে পাঁচ বছরের পুরোনো ক্যালেন্ডারখানা ঝুলছে তার দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে বুবুন। ক্যালেন্ডারে একটা বছর চার-পাঁচেকের ফুটফুটে বাচ্চার হাসিমুখের ছবি। ফুলো ফুলো গাল। একমাথা চুল। বলতে গেলে প্রত্যেকদিনই ছবিটার দিকে চোখ পড়ে তার। কিন্তু সেভাবে তাকায়নি কোনওদিন। বাচ্চাটাকে সশরীরে এ বাড়িতে দেখেওনি কখনও। আর তাছাড়া ওপরতলায় সস্ত্রীক বিজনবাবু ছাড়া এ বাড়িতে তো আর কেউ থাকেও না। এ কাদের বাচ্চা তবে? আর ক্যালেন্ডারেই বা তার ছবি কেন?

বুবুনকে জিগ্যেস করতে জানা গেল এই ঘরে এসে সে ক্যাডবেরির প্যাকেটটা খোলার চেষ্টা করছিল। সেই সময়ই দরজা দিয়ে ছেলেটা ঘরে এসে ঢোকে। সে বুবুনকে বলে, দাও আমাকে ওটা। আমি খুলতে পারব। বুবুনও প্যাকেটটা দিয়ে দেয় আর কিছু না ভেবেই। প্যাকেটটা নিতে নিতে ছেলেটা বলে, আমি এই ঘরেই থাকি। ওই যে দেখ আমার ছবি। বুবুন যেই ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়েছে অমনি ছেলেটা বের করে ফেলেছে ক্যাডবেরিখানা। তারপর সেটাকে ভেঙে মুখে পুরতে পুরতে আর কিছু না বলেই সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সন্দীপদা আর বৌদিও এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। তারাও সবটা শুনল। সন্দীপদা জিগ্যেস করে, এরকম কোনও ছেলেকে এর আগে এ বাড়িতে দেখেছ নাকি পলাশ?

পলাশ হতভম্বের মতো মাথা নাড়ে। এই পাড়াতেই দেখেনি সে অমন কোনও ছেলেকে।

বৌদি এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। ঠায় তাকিয়েছিল সে ক্যালেন্ডারখানার দিকে। হঠাৎ সে বলে ওঠে এখন, ছবিটা দেখ তোমরা। ছেলেটার ঠোঁটটা দেখ।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আরও হতভম্ব হয়ে যায় পলাশ। ছেলেটার ঠোঁটের রং মৃদু খয়েরি। যেন এইমাত্র ক্যাডবেরি খেয়েছে সে। জিভ দিয়ে চেটেছে ঠোঁটটাকে। সেই অবস্থাতেই যেন ছবি তোলা হয়েছে তার। হঠাৎ কেমন আনচান করে ওঠে পলাশের বুকের ভেতরটা।

খেতে বসে আর কেউ কোনও কথা বলে না এ ব্যাপারে। পলাশ একফাঁকে বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আরেকখানা ক্যাডবেরি কিনে এনে দেয় বুবুনকে। খেয়ে-দেয়ে উঠে বৌদি বলল, একটা কথা বলব আমি?

পলাশ আর সন্দীপদা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

তুমি এই বাড়িটা ছেড়ে দাও।

কেন? অবাক চোখে তাকায় পলাশ।

মনে হচ্ছে ঘরটার কোনও দোষ আছে।

সন্দীপদা অবশ্য তীব্র আপত্তি করে, আরে না না, বেকার সুপারস্টিশাস হয়ে লাভ আছে? ওসব দোষ-ফোষ আবার কী জিনিস! তাছাড়া সুমন আর পিনাকী থেকে গেছে এই ঘরে। কই কোনওদিন তো কিছু বলেনি।

বৌদি বলে, কিন্তু আজ যেটা হল...

কী হল? বুবুনের কথায় বিশ্বাস করছ! ক্যালেন্ডার থেকে ওই বাচ্চাটা নেমে এসে ক্যাডবেরি খেয়ে গেছে? তেমন মনে হলে ক্যালেন্ডারটাকে খুলে ফেলে দিয়ে এস পলাশ। মনে কোনও টেনশন থাকবে না আর।

এতক্ষণে মুখ খোলে পলাশ, ফেলে দিয়ে আসব? কিন্তু.....

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগেকার ক্যালেন্ডার। এমনিতেও তো ও আর কোন কাজেই বা লাগবে?

কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ সন্দীপদা। পাঁচ বছর আগে এ বাড়িতে কোনও ভাড়াটেই ছিল না। সবে তিন বছর ভাড়া বসেছে এ বাড়িতে।

তাতে কী হয়েছে?

তার মানে ক্যালেন্ডারখানা টাঙিয়েছিল বাড়িওলাই। এখন বাড়িওলার জিনিস তাকে না জানিয়ে এভাবে ফেলে দিয়ে আসা কি উচিত?

তা ঠিক অবশ্য। বেশ বিজনবাবুর সঙ্গে কথাই বল না হয়।

আমার কিন্তু মনে হয় বাড়িটা তোমার ছেড়ে দিলেই ভালো হয় পলাশ। বৌদি আবার বলে।

না না, ছাড়বে কেন। এত সুন্দর বাড়ি।

বিকেলের পর বিদায় নেয় সন্দীপদারা।

পলাশ এবারে ভালো করে তাকায় ক্যালেন্ডারখানার দিকে। সুদীপ্ত মুখার্জি নামক জনৈক ট্যাক্স কনসালট্যান্টের ক্যালেন্ডার। চেম্বারের অ্যাড্রেস বীরেন রায় রোড। যোগাযোগের জন্য দু'খানা মোবাইল নম্বরও দেওয়া আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যালেন্ডারখানা দেখছিল পলাশ। আচমকা ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই নিমেষে সে পাথর হয়ে গেছে। বাচ্চাটার ঠোঁটের রং টুকটুকে লাল। যেন ক্যাডবেরি খেয়ে-দেয়ে আবার মুখ ধুয়ে এসেছে সে। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে পলাশ।

বিজনবাবুর সঙ্গে কথা বলবে নাকি? পলাশের মনে হয় অবিলম্বেই তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। সুদীপ্ত মুখার্জি কে? বিজনবাবু নিশ্চয় চিনতেন সেই লোকটিকে। পাঁচ বছর আগে এই ক্যালেন্ডার এনে তিনি এ ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়েছিলেন যখন। পলাশের মনে হয় আচমকা ঘনিয়ে ওঠা এই রহস্যের সঙ্গে সুদীপ্ত মুখার্জি নামক সেই অদেখা ভদ্রলোকের নির্ঘাত কোনও যোগসূত্র আছে।

দোতলায় বিজনবাবুর ঘরে যেতে তিনি পলাশকে বেশ সমাদর করেই বসালেন। বিজনবাবুর স্ত্রী বললেন, চা খাবে তো?

না মাসিমা। অনেক খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে দুপুরে। সন্দীপদারা সব এসেছিল আজকে। পলাশ হাসিমুখে জবাব দেয়।

আরে তাতে কী হয়েছে! খাও খাও। চা খেলে কোনও অসুবিধে নেই। কিছুতেই শুনলেন না মাসিমা।

দু'চারটে এটা-সেটা কথার পর পলাশ জিগ্যেস করল, আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করব বলে এসেছিলাম। সুদীপ্ত মুখার্জি কে? তাঁকে কি আপনি চিনতেন?

চিনব না মানে! সুদীপ্ত আমারই ছেলে। কেন? বিজনবাবু হাসেন।

কয়েক মুহূর্ত যেন বাকরুদ্ধ হয়ে থাকে পলাশ। কোনও কথা আর জোগায় না মুখে। তার মানে ছবির বাচ্চাটা...

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পলাশ জিগ্যেস করে, আসলে একটা কথা জানবার জন্যে জিগ্যেস করছিলাম। একতলার ঘরে যে ক্যালেন্ডারটা টাঙানো আছে সেই ছবির বাচ্চাটা মানে...

মুখের কথা মুখেই থেমে যায় পলাশের। বিজনবাবু হঠাৎ মাথা নিচু করেন। মাসিমারও মুখ থমথমে হয়ে যায় এক মুহূর্তে। আঁচলের খুঁট দিয়ে যেন চোখের কোণটা মুছলেন তিনি। তারপর অতিকষ্টে বললেন, ওই বুবাইয়ের জন্যেই আমাদের বাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। চারিদিকে এত স্মৃতি ছড়ানো বুবাইয়ের। কিছুতেই আর থাকতে পারল না বাবু। রিষড়ায় মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল বুবাই। মামার সাইকেলে চেপে যাচ্ছিল...

কিছুই বুঝতে না পেরে পলাশ হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

সামলে উঠতে সময় নেন বিজনবাবু। এরপর তিনি বুবাইয়ের কথা বলতে শুরু করেন। শুনতে শুনতে গা-হাত-পা শিরশির করে ওঠে পলাশের। গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি এক অকৃত্রিম আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায়। হায় ভগবান! এ কোথায় এসে ভাড়া উঠেছে সে? এমনি করেই কি সবকিছু মিলিয়ে দিতে হয়? বিজনবাবুর সামনে এই মুহূর্তে সে আর বসে থাকতে পারছে না। সবটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবারে। হ্যাঁ সেই ঘটনাটা ঘটেছিল রিষড়ায় জিটি রোডের ওপর। আর ঠিক এপ্রিল মাস তখন। মনে পড়ছে এবারে। চার বছর আগেকার কথা। এতদিনে ভুলতেই বসেছিল পলাশ।

আর থাকা চলবে না এই বাড়িতে। একমাস হতে আর খুব বেশিদিন বাকি নেই। কালকেই সে জানিয়ে দেবে বিজনবাবুকে যে সে আর থাকছে না। সন্দীপদাকে বলবে আবার নতুন ঘরের পাত্তা লাগাতে। নয়তো গিয়ে হোটেলে উঠবে কোনও। গাছতলাতেও শুতে রাজি আছে। খালি এই বাড়িতে আর নয়।

সন্ধে নেমেছে ততক্ষণে। দোতলা থেকে প্রায় পালিয়ে এল পলাশ।

ঘরে এসেই ঠিক করে ফেলল সে—আজ রাতে বেডরুমে শোবে না। পাশের ঘরে যে সোফাখানা রয়েছে রাতটুকু তাতে শুয়েই কাটিয়ে দেবে। শুধু আজ রাত নয়, আর যে ক'টা দিন আছে এ বাড়িতে, বেডরুমটায় আর শোবেই না পলাশ। তালা মেরে রেখে দেবে ঘরখানাকে রাত্তিরবেলায়।

দুপুরের মাংস কিছুটা পড়ে ছিল বাটিতে। অল্প একটু ভাত ফুটিয়ে নিল পলাশ। খিদে নেই একদম। কোনও-রকমে একটু খেয়েদেয়ে একটা বালিশ নিয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল সোফায়। ঘুম আসছিল না। বেডরুমটাকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তাও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। কোথাও খুট করে একটু শব্দ হলেও টর্চ হাতে উঠে বসছিল সে। চোখে আলো পড়লে একেবারে ঘুম হয় না তার। কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে কম পাওয়ারের একটা ডিমলাইট জ্বেলে শুতে হয়েছে।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই মাঝরাতের দিকে একটু ঘুম এসেছিল চোখে। শুয়ে শুয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল পলাশ। সেই রিষড়ার রাস্তা। হাতে আছে আর মোটে মিনিট পাঁচেক। ডক্টর লাহার চেম্বারে পৌঁছতেই হবে তার মধ্যে। কোনও-রকমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস হলে বসের কাছে ঝাড় খাওয়া নিশ্চিন্ত। নতুন চাকরি। ঝড়ের বেগে বাইক চালাচ্ছিল পলাশ। আচমকা একটা সাইকেল কখন এসে পড়েছে উল্টোদিক থেকে খেয়ালই করেনি সে। বছর পঁচিশের একটা ছেলে চালাচ্ছিল সাইকেলটা। যখন খেয়াল করল পলাশ ততক্ষণে আর কিছু করার নেই। দু'তিনটে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল ছেলেটা। জোর লেগেছে। প্রথমে খেয়াল করেনি, একটা বছর চার-পাঁচেকের বাচ্চাও বসেছিল সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ছুটছে এখন তার। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল পলাশ। পরক্ষণেই খেয়াল হল লোক জমছে জিটি রোডের ওপর। এরপর ধরা পড়লে কপালে যে কী আছে কে জানে। মুহূর্তে ক্লাচ চেপে গিয়ারে পা ফেলল পলাশ। পরক্ষণেই মোচড় দিল অ্যাক্সিলারেটরে। এখন আহতদের নিয়ে মেতে উঠবে মানুষজন। তার গাড়ির নম্বর নোট করার কথা খেয়াল থাকবে না কারও। এই সুযোগেই পালাতে হবে ঝড়ের বেগে।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে পলাশের। ঘরের ভেতর তখন আবছা আলো- অন্ধকারের কুয়াশা। এতক্ষণ এক কাতে শুয়েছিল পলাশ। এবারে পাশ ফিরে শুতে গিয়েই বাকরুদ্ধ হয়ে উঠল সে। বুবাই দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক মাথার কাছটায়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ক্যালেন্ডারে যেমন হাসিখুশি মুখ দেখেছিল বুবাইয়ের এখন সেই মুখটাই ঘরের আবছায়া আলোয় কী বীভৎস হয়ে উঠেছে। নাকে-মুখে রক্তের দাগ। ডান চোখের ভুরুর ওপরটা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে বুবাই তার মুখের দিকে।

ছবি ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

দুঃখীরাম শান্তিরাম

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

শান্তিরাম?

ইয়েস স্যার, আই অ্যাম। তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হয়।

এ আর নতুন কথা কী স্যার! এ তো রোজকার কথা। শুনে শুনে কান পচে গেছে।

দুঃখীরাম রেগে যায়, কান পচে গেছে! তাহলে আমি যা চাই তার কী হবে?

স্যার, মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না, আর যা পায় সবসময় তা চায় না।

তুমি তো ভূত, মানুষের মতো কথা বলছ। তোমরা যা চাইবে তাই তো পাবে।

শান্তিরাম হাসে, তাই যদি হয় স্যার, তাহলে ভূত আর ভগবানে পার্থক্য থাকত না।

দুঃখীরামের মুখে বিরক্তি, তর্ক কোরো না। কেন আর পাঁচটা ভূতের মতো হতে পারো না? ভয়ের জন্যেই তো ভূতের সৃষ্টি। তোমাকে দেখে যদি ভয়ই না হয় তাহলে ভূত পুষে কী হবে? এক একটা ভূতের গল্প শুনলে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। সেই সব গল্প ছেলেমেয়েরা গপগপ করে গেলে।

শান্তিরাম যুক্তি দেখায়, গপগপ করে খেলে গলায় আটকে যেতে পারে। তারপর হজম হবে না।

লাফিয়ে ওঠে দুঃখীরাম, অসহ্য। তোমার জন্যে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

এ তো স্যার ভীরু, কাপুরুষদের কথা। সবাই জিততে চায়। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখুন। কেবল ভীরুরা হেরে গেলে সুইসাইডের কথা ভাবে।

চাচা, চাচা, দুঃখীরাম ভূতো মিঞাকে ডাকে।

ভূতো মিঞা নাদুস-নুদুস ভুঁড়িটাতে তেল মাখাচ্ছিল। দুঃখীরামের ডাক শুনে ছুটে আসে, কী ব্যাপার! এত ডাকাডাকি কেন?

চাচা, তুমি এই ভেজাল ভূতটাকে নিয়ে যাও। তুমি আমায় ঠকিয়ে ভূত বলে একটা অদ্ভুত মালকে গছিয়েছ। তোমার জিনিস তুমি ফেরত নাও। সুদ সমেত আমার টাকা মিটিয়ে দাও।

কথা শুনে ভূতো মিঞার চক্ষু চড়কগাছ। আসলের সুদ, সুদের সুদ, তার সুদ। ভূতো মিঞা কাঁদতে শুরু করে, কোথায় যাই? আমি এখন কী করি? কোথা থেকেই বা টাকা ধার করি? কাউকে বিক্রি করে ক'টাকাই বা পাব? একে ভেজাল, তার ওপর সেকেন্ড হ্যান্ড ভূত। গায়ে ভূতের গন্ধই নেই। কী করি?

হঠাৎ ভূতো মিঞার মাথায় একটা আইডিয়া আসে, হয়েছে। শান্তিরাম?

শান্তিরাম ছুটে আসে, বলুন দণ্ডমুণ্ডের মালিক?

এসো। তেপান্তরের ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। সার্ভিস সেন্টারে।

কী ভাবে যাব, মালিক?

কেন? তুমি আমাকে কাঁধে নাও। তারপর তেপান্তরে সোজা।

আপনাকে কাঁধে! মরে যাব, মালিক। আড়াই মনের কুমড়ো। দুমড়ে-মুচড়ে আমার কী অবস্থাটা হবে ভাবুন তো। তার চেয়ে আপনি আমাকে কাঁধে নিন।

তোমাকে কাঁধে নোব? বলছ কী!

আপনি তো বুঝতেই পারবেন না, কারণ আমি আছি অথচ নেই। ওজন শূন্য।

তাই হবে। তোমাকে তেপান্তরে নিয়ে যাবই। বুঝতে পারছি তোমাকে অয়েলিং করাতে হবে।

হাসে শান্তিরাম, পার্টসই নেই তো অয়েলিং।

শান্তিরামকে কাঁধে নিয়ে ভূতো মিঞা তেপান্তরের পথে রওনা দেয়।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছরও যাব যাব। না আসে শান্তিরাম, না ভূতো মিঞা। শেষে বাধ্য হয়ে দুঃখীরাম একাই তেপান্তরের পথ ধরে। যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। এটা পাচ্ছে, ওটা পাচ্ছে, তাই খাচ্ছে। হঠাৎ সামনে পড়ল এক নদী। নদী কোনোরকমে পেরোয়, তো পড়ল বন। ব্যস পথ হারিয়ে ফেলে দুঃখীরাম। এদিকে বেলা গড়িয়েই যাচ্ছে। থামছে না। দুঃখীরাম পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করে। দুঃখীরাম একবার চারপাশ দেখে নেয়। রাজা কাঁদছে, দেখে লোকে ছি ছি করবে না! কিন্তু অসহায় দুঃখীরাম। এদিকে রাত নামল বলে। শেষে সূর্য টুপ করে দিগন্তে যেই ডুব দিল, এক অথর্ব বুড়ো লোকের দেখা পেল।

কে তুমি গা? বসে বসে কাঁদছ?

আর বল কেন, আমি এক পথিক। যাব তেপান্তরে। পথ হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে যদি বলে দাও কোন পথ গেছে তেপান্তরে, জায়গাটা আর কত দূরে তাহলে খুব উপকার হয়।

লোকটা একটু হাসল, ও এই কথা! আমার সঙ্গে এস।

দুঃখীরাম লোকটার পিছু নেয়। ও বাবা! কোথায় যাচ্ছে ওরা! এ যে গভীর বন। কিন্তু কী আর করবে সে। আর কোনও উপায় নেই।

কিছুটা যাবার পর লোকটা বলল, আজ আর হাঁটা যাবে না। একেই বন তার ওপর রাত। সকাল হলে আবার বেরোব।

রাতে থাকব কোথায়? শুধোয় দুঃখীরাম।

দেখা যাক, থাকার একটা ডেরা পাওয়া যায় কিনা।

ওরা এগোয়। এদিকে তাকায়। ওদিকে তাকায়।

ঐ তো একটা পোড়ো বাড়ি। এসো। ওখানেই যাই।

একে বন, তার ওপর ভূতের বাড়ি। দুঃখীরামের গা ছমছম করে। ভাবছে যাবে, না যাবে না।...ভূতের ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়। জন্তু- জানোয়ার, সাপখোপ। সবই থাকতে পারে। কিন্তু কীই বা করা যাবে। এইভাবে বনের মধ্যে ঘুরলে বেঘোরে প্রাণ যাবে।

ওরা বাড়িটার ভেতর ঢুকল। সব দেখে দুঃখীরামের চক্ষুস্থির। বাড়ি, ঘর, আসবাবপত্র সব ঝকঝকে, তকতকে। দুঃখীরাম অবাক।...মনে হচ্ছে কেউ থাকে। কিন্তু এই বনের মধ্যে! নিশ্চয়ই ভূত, কিংবা ডাকাত। ডাকাতরা সাধারণত রাতে ডাকাতি করতে বাইরে বেরোয়, দিনে ফিরে আসে। আর ভূতেরা দিনে পালায়। রাতে এসে জড়ো হয়। আশ্চর্য! ভেতরের দক্ষিণদিকের জানলাটা ছাড়া সব জানলা কপাট বন্ধ। ব্যাপার-স্যাপার ভালো মনে হচ্ছে না। তবে একটা তো রাত। ডাকাত হলে ভয় নেই। ভূত হলে?

কিন্তু বুড়োটা কোথায় গেল?

দুঃখীরাম এদিক-ওদিক তাকায়। লোকটাকে দেখতে পায় না। দুঃখীরাম দক্ষিণদিকের জানলাটা বন্ধ করে। বিছানা পাতাই ছিল, তার ওপর শুয়ে পড়ে। দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

এদিকে রাত বাড়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে জানলাটা খুলে যায়। দুঃখীরামের ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে দক্ষিণদিকের জানলাটা খোলা।...কে খুলল? ভূত? ডাকাত? বুড়ো লোকটা? কিন্তু দরজা বন্ধ!

উঠে পড়ে দুঃখীরাম। জানলাটা বন্ধ করে দেয়।....দেখতে হবে ব্যাপারটা কী।

অবাক কাণ্ড! দুঃখীরাম বিছানায় পা তুলেছে কি না তুলেছে আবার জানলাটা খুলে গেল। আর বাতাস এসে দম বন্ধ করা আবহাওয়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। কী মিষ্টি কিন্তু কী ভয়ঙ্কর! দুঃখীরামের গা ছমছম করে। ও একবার চারদিকে তাকায়। শুধুই অন্ধকার। হঠাৎ দেখে গোলাকার একটুকরো আলো। ছাদের ওপর ওঠার সিঁড়িও রয়েছে। আলোর বৃত্তটা ধীরে ধীরে একটার পর একটা ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে। ভয়-মাখানো কৌতূহল নিয়ে দুঃখীরাম দু'পা এগোয় তো এক পা পিছিয়ে আসে। কৌতূহল ঠেলে নিয়ে যায় সামনে, ভয় পেছনে। ভয়কে জয় করা যায়, কৌতূহলকে কখনই নয়। দুঃখীরাম আলোটাকে অনুসরণ করে। একসময় ওপরে ওঠে। ও দেখবে, কে বাইরে থেকে ঠেলে জানলাটাকে খুলে দিচ্ছে। দুঃখীরাম ছাদের ধারে আসে, এরপর মাথাটা নামিয়ে দেখছে। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে তার ঘাড়টা হাত দিয়ে চেপে ধরে। দুঃখীরাম সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতটাকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিতেই কিছু একটা সেকেন্ডের মধ্যে মাথা টপকে নীচের দেওয়ালে নেমে এল। দেখতে ব্যাঙের মতো তবে আকারে বড় একটা কাছিম। চোখ দুটো ধকধক করছে। দ্রুত দেওয়াল বেয়ে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দুঃখীরাম ভয় খেল ঠিকই, তবে আনন্দে চোখে জল এসে গেল। এ যে ভূতের কাজ এ ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর এটাই তো ও মনে মনে চায়। ভূতের ভয়ে রক্ত জমে যাবে না! একটা কাউকে তো ভয় খেতে হবে। পুলিশকে লোকে যতটা না ভয় খায় ভূতকে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ভয় খায়। কেন যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে পুলিশ পোষা হয়। এটা সত্যি,

পুলিশ পোষ মানে। ভূত সহজে বশ হবে না। বরং ভূতের মতো ভূত হলে হাত-পা অবশ হয়ে যাবে। শান্তিরাম পোষা ভূত, কিন্তু ভয় দেখাবার একটা টেকনিক আছে। তার জন্যেও ট্রেনিং নিতে হয়। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এক একটা টেকনিক নিতে হবে। যখন যা, তখন তা। বাচ্চাদের যেভাবে ভয় দেখানো হয়, বুড়োদের সেইভাবে ভয় দেখালে চলবে না। তবে বুড়োই হোক আর বাচ্চাই হোক, যারা বিচ্ছু, বিছে নিয়ে খেলা করে, বিষধর সাপের ল্যাজ তুলে ধরে, তাদের ভয় দেখাবার আগে ভূতেরা যদি ভালো করে না ভেবেচিন্তে অপারেশন করতে নামে, তাহলে ওদের মানসম্মান নিয়ে টান পড়বে। ভূতও বেকায়দায় পড়বে। ওদের পাড়ায় নফর বলে একটা লোক থাকত। একদিন পরের বাগানে আম চুরি করতে গেছে। পড়বি তো পড় এক ভূতের হাতে। লোকটা ঘরের মধ্যে একা ঘুমোচ্ছিল। স্বপ্ন দেখছে— বিয়েবাড়িতে গেছে। বড় বড় রসগোল্লা। বড় বড় পান্তুয়া। ও মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটল। ওর তো আনন্দে, উত্তেজনায় নাক ডাকবে ডাকবে করছে। এমন সময় কে যেন তার নাক টিপে ধরল। ঘুম ভেঙে গেল। রাতটা গড়াতে গড়াতে চারটে বেজে দশ-মিনিটে থেমে গেল। মোরগদের ডাকার অবসর করে দিল। লোকটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারের কার্পেট মাড়িয়ে। এখন আমবাগানে যেই না ঢুকেছে, যা শোনা যায় না, দেখা যায় না, সেটাই শুনতে পেল, পরে দেখতে পেল। প্রথমে গোঙানির শব্দ, তারপর কান্নার। কী করুণ কান্না, 'মরে গেলাম। আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।' লোকটা ছুটে গেল।

কে তুমি? কী হয়েছে? নফর শুধোয়।

আমি কে?

লোকটা মুখ তুলল। অন্ধকারের চাদরটা মুখ থেকে সরাতেই নফর নট নড়নচড়ন। কী কদাকার, ভয়ঙ্কর মুখ! গলার বাইরের দিকটা দিয়ে গনগনে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

সে পালাতে গিয়েও পারল না। কী মানুষ, কী ভূত। যন্ত্রণা হলে কার না কষ্ট হয়। যার হচ্ছে সে যেমন কষ্ট পায়, যারা দেখে তারাও কষ্ট পায়।

কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? নফর জিগ্যেস করে।

ভূতটা গলা দেখায়, ক্যানসারের যন্ত্রণা। যখন বেঁচে ছিলাম তখন নেশা করতাম। কুসঙ্গে পড়ে বিড়ি, তারপর সিগারেট ধরলাম। নেশা আস্তে আস্তে আমায় গিলে ফেলল। ডাক্তার সাবধান করল। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলাম। তারপর ক্যানসার চেপে ধরল। যতদিন বেঁচে ছিলাম কী যন্ত্রণাই না ভোগ করেছি। মারা গেলাম। কিন্তু যন্ত্রণা পিছু ছাড়ল না।

দেহ পুড়ে যাবার পর তো সব শেষ।

না, আগে ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। এখন দেখছি পাপের ফল মৃত্যুর পরেও ভোগ করতে হয়।

নফর সব শুনল কিন্তু করার তো কিছুই নেই। তবু বলল, আমি কী করি বুঝতে পারছি না।

একটা কাজ করলে আমি বেঁচে যাই।

কী কাজ শুনি। সম্ভব হলে ভেবে দেখতে পারি।

সম্ভব। আমার রোগটা তুমি যদি নাও, তাহলে আমার যন্ত্রণামুক্তি সম্ভব।

তা কী করে সম্ভব! আমি যাচ্ছি।

নফর যেই না পিছু ফিরেছে অমনি ভূতটা দু'হাত দিয়ে ওর গলা চেপে ধরে, পরের বাগানে আম চুরি করতে এসেছিস। শাস্তি পেতেই হবে। কেমন মজা! কীরকম ট্যাকটিস!

নফর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ছেড়ে দাও, মরে যাব।

আমার রোগটা তোকে দেব।

আমার কী লাভ? কেন আমি যন্ত্রণা সহ্য করব?

টাকা নিবি? অনেক অনেক টাকা। দু'ঘড়া মোহর। বাড়ি, গাড়ি, বিষয়, সম্পত্তি। আম, নারকোল চুরি করে বেড়াতে হবে না।

লোকটাকে লোভ চেপে ধরল, নেব। নিশ্চয়ই নেব। কোথায় মোহর?

এখানেই আছে। মাটি খুঁড়লেই পাবি। আমি পাহারা দিই।

মাটি খুঁড়তেই মোহর বেরিয়ে পড়ল। নফর দু'হাত বাড়ায় নেবো বলে। ভূতটা বলল, এমনি কিছু পাওয়া যায় না।

তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

সারা জীবন সুখ ভোগ করবি। মরার পর আমার রোগটা তুই নিবি। কী যেন তোর নাম?

নফর।

রক্ত দিয়ে লিখতে হবে, মৃত্যুর পর খুনি বাদলার আত্মার ক্যানসার রোগ আমি নেব বলে কথা দিচ্ছি। এরপর নাম সই করতে হবে।

নফর একটু ভাবল, পরকাল আছে না নেই, কেউ জানে না। ইহকালে তো সুখ ভোগ করে নিই। তারপর যা হয় হবে।

নফর রক্ত দিয়ে লিখে যেই না নাম সই করল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশগঙ্গা দিয়ে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। এরপর একটা অকল্পনীয় বীভৎস, বিস্ফারিত, ভীষণদর্শন মুখ সেই রক্তগঙ্গা দিয়ে ওপরে উঠে নফরের দিকে চেয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। নফর মোহরের ঘড়া নিয়ে বাড়ি ফিরল। অর্থ নেবার সময় একবারও মনে হল না কিসের বিনিময়ে সে ঐ অর্থ সংগ্রহ করল। গল্পটা নফরের মুখ থেকেই শোনা। ভূতের ফাঁদে পড়ে পরকাল গেল।

দুঃখীরাম চারদিকে তাকায়। হঠাৎ দেখল একটু দূরে একটা বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গা। তারই উত্তর-পুব কোণে সেই আগুনের গোলা

দুটো। ছাদ বেয়ে নেমে ক'মুহূর্তের জন্যে জঙ্গলের মধ্যে চোখ ঢাকা দিয়েছিল। দুঃখীরাম ভয় খেল না। ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটল জায়গাটার দিকে। নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌঁছল কৌতূহলী হয়ে। একফালি চাঁদের এক টুকরো আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে লাফাচ্ছে। ...কোথায় লুকিয়ে পড়ল ও দুটো?

এদিক তাকায়, ওদিক তাকায়। পাতি পাতি করে খোঁজে জায়গাটা। একটা গর্ত দেখতে পেল।...গর্তের ভেতরে লুকোয়নি তো? জানতেই হবে কী আছে ভেতরে। যেখানে জ্বলন্ত চোখ দুটো মিলিয়ে গেল সেখানেই বা গর্তটা এল কী করে?

লোকে ভয় খায়, দুঃখীরামের মনে দারুণ আনন্দ। হঠাৎ অবাক চোখে দুঃখীরাম দেখে গর্তটা দিয়ে পিলপিল করে জোনাকি পোকারা বেরোচ্ছে। মনে দুঃখীরামের একটা প্রশ্ন জাগে, কেন? যারা ভেতরে ছিল তারা বাইরে এল কেন? দেখতেই হবে ব্যাপারটা।

দুঃখীরাম গর্তের ভেতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর? একটা কোনো কিছুর গায়ে হাত ঠেকল। দুঃখীরাম ভাবল, হয়তো খরগোশ, ধেড়ে ইঁদুর, কটাস কী ভোঁদড়। ও হাতটা বের করবে এমন সময় কে ওর হাতটা চেপে ধরে ভেতরের দিকে টানতে লাগল। যেই টানুক গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। হেরে যায় দুঃখীরাম। যেটা অকল্পনীয়। যা ঘটে না, ঘটতে পারে না, যা অবিশ্বাস্য সেটাই ঘটে গেল। ছোট্ট গর্তের ভেতর দিয়ে দুঃখীরামের বিরাট দেহটা ঢুকতে লাগল। ঢুকছে, ঢুকছে, ঢুকছে। ঢুকছে তো ঢুকছেই। তারপর সে এক অবাক কাণ্ড! চারদিক আলোয় ঝলমল। মেঝেয় মখমল। বেশ ক'জন লোক এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। ওরা লম্বায় দেড় ফুট। চওড়ায় দেড় ফুট। গায়ে জমকালো পোশাক। দুঃখীরামকে দেখেই ওরা কুর্নিশ

কে তার ঘাড়টা হাত দিয়ে চেপে ধরে

ঠোকে। তারপর সামনের গদি-আঁটা সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে বসায়। ইঙ্গিতে কথা চলছে।

এক মিনিটের রাজা, এক মিনিটের রাজা, সবাই সমস্বরে বলে। এরপর ভেটের পর ভেট। সিন্দুকের পর সিন্দুক। সোনা, হিরে, মণি, মাণিক্য, মুক্তোয় ভরা।

এ সব আপনার।

দুঃখীরাম কথা বলবে কি সবকিছু দেখেশুনে হতবাক। দুঃখীরাম চোখ রগড়ায়। ভাবে, স্বপ্ন দেখছে না তো?

চারদিকে যা কিছু দেখছে সব যেন আলাদা, অন্যরকম বা রকমফের। একজন গুনছে, এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড, তিন, চার, পাঁচ.....

সিংহাসনের দু'ধারে দুটো পুকুর। লেখা আছে, সুখপুকুর, দুখপুকুর।

বাইরে থেকে একজন করে লোক আসে। দু'পুকুরে ডুব দেয়। একটা করে পদ্মফুল ফোটে। দেখতে দেখতে পুকুর দুটো পদ্মফুলে ভরে যায়। কোথা থেকে একপাল ছেলেমেয়ে আসে। দুজন লোক একটা করে পদ্মফুল তোলে আর ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে বলে, যাও, শত্রুদের হাতে একটা করে ফুল দাও।

এখন যেই না ষাট সেকেন্ড পূর্ণ হল, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীরামকে ওরা প্রথমে সুখপুকুরে তারপর দুখপুকুরে ফেলল। দুঃখীরাম পদ্মফুল হয়ে গেল। একজন ফুলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফুল চাই, টাটকা পদ্মফুল চা—ই?

ছুটে এল চারজন খদ্দের।

দাম কত?

এক হাজার এক স্বর্ণমুদ্রা।

দাম শুনে তিনজন পালিয়ে গেল। একজন এক হাজার একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পদ্মফুলটা কিনে নিল।

লোকটা পদ্মফুলটা এনে ফুলদানিতে রাখে, তারপর কাজে যায়। তারপরই ঢোকে বাড়ির কাজের মেয়ে। এত গরিব যে বেশিরভাগ দিনই একবেলা খেতে পায়। বাড়িতে মা, বাবা আছে, তবে একরকম না থাকাই। রোগে জরাজীর্ণ। না ওষুধ,

না পথ্য। মেয়েটির চোখের জলের এক ফোঁটা পদ্মফুলের ওপর পড়ে।

কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন মেয়ে?

মেয়ে তো অবাক, কে কথা বলল? চারদিকে তাকায়। না, কেউ কোথাও নেই।

বুঝেছি গো বুঝেছি। তোমার খুব কষ্ট। এক কাজ কর। পদ্মফুলের একটা পাপড়ি ভেঙে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। তাই দিয়ে তোমার বাবা, মায়ের চিকিৎসা করাবে।

কাজের মেয়ে অবাক, পদ্মফুলের একটা পাপড়ির এত দাম! দেখাই যাক না। বাজারে তো যাই।

পাপড়ি নেবে গো? পাপড়ি চাই?

কেউ মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, কেউ বলে, দাম দিয়ে কেউ পাপড়ি কেনে? এক ফকির এসে প্রচুর টাকা দিয়ে পাপড়িটা কিনে নেয়।

কাজের মেয়েকে বলে, তবে আমি পদ্মফুলটাকে একবার দেখতে চাই।

ও, এই কথা! তা চল না। আমার মনিব খুব ভালো লোক।

ফকির কাজের মেয়ের পিছু পিছু ওর মনিবের বাড়ি এল। পদ্মফুলের কাছে যেই এল, অবাক কাণ্ড! ফুলটা শুধোল, আমার মুক্তি কীসে?

ফকির অবাক হল না। বলল, মানুষের মঙ্গলের জন্যে সব পাপড়ি যখন দান করে দেবে তখনই মুক্তি পাবে।

এদিকে কাজের মেয়ের মুখ থেকে চারদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। এক বুড়ি এল। সাত কুলে কেউ নেই। বলল, কাজের মেয়ে, কাজের মেয়ে, আমার কেউ নেই গো। তবু চেয়েচিন্তে চলে যাচ্ছিল। এখন চোখে দেখতে পাই না। তিনদিন না খেয়ে আছি। একটা পদ্মফুলের পাপড়ি দাও না।

দেখি, পদ্মফুল কী বলে।

কাজের মেয়ে যেই না পদ্মফুলের কাছে কথাটা বলল, অমনি ফুল থেকে এক ফোঁটা কান্না শিশির হয়ে ঝরে পড়ল।

কাজের মেয়ে, একটা পাপড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে দাও।

এরপর এক একজন আসে, কাজের মেয়েকে ধরে। পদ্মফুলবেশী দুঃখীরাম বলে, দারিদ্র্যই অভিশাপ। ওকে রাজ্য থেকে হটাতে হবে।

একদিন সব পাপড়ি শেষ হল। তখনই দুঃখীরাম নিজেকে ফিরে পেল।

স্যার!

চমকে ওঠে দুঃখীরাম, শান্তিরাম!

হ্যাঁ স্যার। আপনার গোলাম। আমিই বনের বুড়ো। আমিই পদ্মফুল কিনলাম। তার আগে মাটির নীচে ভূতের রাজ্যে নিয়ে গেলাম। কীরকম সার্ভিস দিলাম?

কিন্তু ভূতো মিঞা? আমার কাজি?

সার্ভিস সেন্টারে।

সার্ভিস সেন্টারে! ভূতো মিঞাই তো তোমাদের অয়েলিং করে।

কথাতেই তো আছে, স্যার, ডক্টর হিল দাইসেলফ্। ডাক্তার, আগে নিজের রোগ সারাও। তারপর রোগীর রোগ সারাবে।

ছবি ঃ সুবল সরকার

Dictionary অভিধান

Dev's Students' Favourite
(Eng. to Beng. & Eng.) 320.00

Dev's Students' Favourite
(Beng. to Eng.) 260.00

Dev's Concise Dictionary
(Eng. to Beng. & Eng.) 150.00

Dev's Concise Dictionary
(Beng. to Eng.) 130.00

Dev's Pocket Dictionary
(Eng. to Beng. & Eng.) 120.00

Dev's Pocket Dictionary
(Beng. to Eng.) 115.00

Dev's Midget Dictionary
(Eng. to Beng. & Eng.) 60.00

Dev's Midget Dictionary
(Beng. to Eng.) 55.00

আশুতোষ দেব প্রণীত

নূতন বাঙ্গালা অভিধান ৪৫০.০০

অন্ত্যমিল অভিধান ১৫০.০০

শব্দবোধ অভিধান ২৮০.০০

নববিধান ১৪০.০০

সরল অভিধান ৬০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
☎ ২৩৫০-৪২৯৪, ৪২৯৫, ৭৮৮৭

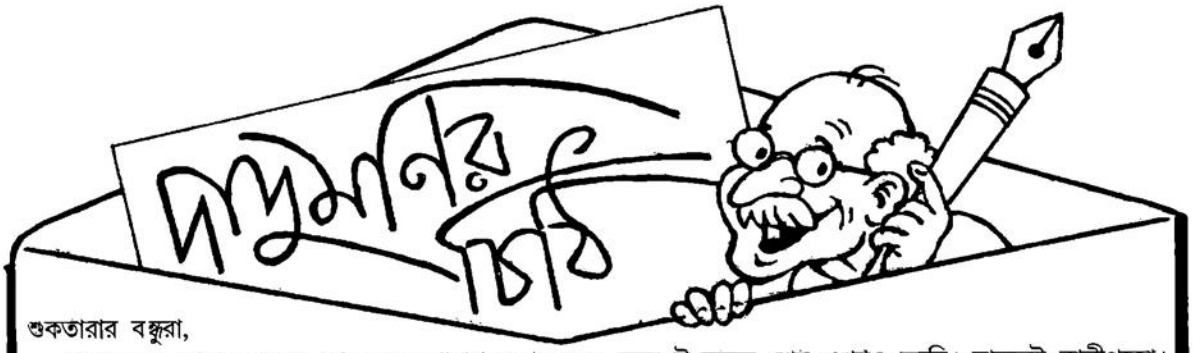

শুকতারার বন্ধুরা,

পুজো এল আবার চলেও গেল। মন খারাপ করা সময়। তবে উৎসবের শেষ এখনও হয়নি। সামনেই কালীপুজো। বাজি পোড়ানোর আনন্দে মেতে ওঠার সময়। যাই হোক তোমরা তো জানো, পড়ার বইতেও পড়েছ ভূমিকম্প কেন হয়। ভূমিকম্পের পেছনে থাকে টেকটোনিক প্লেট। মজার কথা কি জানো, পৃথিবীর মতো টেকটোনিক প্লেটের খোঁজ মঙ্গল গ্রহেও পাওয়া গেছে। তবে পৃথিবীর মতো ঘন ঘন ভূমিকম্প মঙ্গলে হয় না। তার কারণ মঙ্গল গ্রহে টেকটোনিক প্লেট আছে মাত্র দুটি যেখানে পৃথিবীতে সাতটি। এ খবর জানিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গলে টেকটোনিক প্লেটের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। তার মানে মঙ্গল গ্রহেও ভূমিকম্প হয়, তবে পৃথিবীর মতো এত ঘন ঘন নয়। মঙ্গল গ্রহের একশোটিরও বেশি ছবি বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। গবেষক অ্যান লিন বলেছেন, মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এটি হিমালয় ও তিব্বতের চ্যুতির মতো। সেখানেই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। লিন আরও বলেছেন, মঙ্গল কী করে সৃষ্টি হল তা জানতে আরও গবেষণার দরকার। পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের মিল কতোটা সেটা খুঁজতে গিয়েই টেকটোনিক প্লেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে সব থেকে সাহায্য করেছে ঐ একশোটা ছবি। কিউরিওসিটি নামে রোবট-যানটি ঐ ছবিগুলো পাঠিয়েছে। যানটি এখনও কাজ করে চলেছে। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য যানটি পাঠাবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

এবার এসো তোমাদের চিঠির ঝাঁপি খুলি।

মনোরঞ্জন গড়াই (C/O মতিলাল গড়াই, দেশবন্ধু রোড, আশু সহিস লেন, পুরুলিয়া-৭২৩ ১০১)

উত্তর ঃ তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আরও খুশি হয়েছি তোমার ছেলের কথা শুনে। এই বয়সেই সে শুকতারা উল্টেপাল্টে দেখে, ছবি দেখে। খুব ভালো অভ্যেস। এর পর পড়তে শুরু করবে। আর কী চাই। তোমার প্রস্তাবটা খুব ভালো। পুরস্কৃত গল্পের সংকলনের ব্যাপারে আমি কর্তৃপক্ষকে জানাবো। ভালো থেকো।

হেমন্ত দাশ (প্রযত্নে—আশিস বিশ্বাস, এস এস রোড, তারাপুকুর (পশ্চিম) আগরপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা-৭০০ ১০৯)

উত্তর ঃ আপনার চিঠির কিছু অংশ ছেপে দেওয়া হল ঃ

স্কুল জীবন থেকে শুকতারা আমার খুব প্রিয়। বর্তমান বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। এখনও সমান আকর্ষণ বোধ করি।

অলোক কয়াল (পোঃ-জোকা, কলকাতা-১০৪)

উত্তর ঃ ছেলেবেলাকে ধরে রাখায় আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়। আপনি যেমন শুকতারা পেলে পান। আপনার ছেলে ১২ বছর বয়সে সব ধাঁধার উত্তর সঠিক দিতে পেরেছে বলে আমরা আনন্দিত।

সৌম্য ও পূজা (প্রযত্নে—তারাপদ পাল, কাঁটরাপোতা, পোঃ-লাকুর্ডি, জেলা-বর্ধমান-৭১৩ ১০২)

উত্তর ঃ বৃষ্টি পড়লে গাছরা তো খুশি হবেই। গাছরা সত্যিই কথা বলে। গাছদের ভালোবাসলে তা বোঝা যায়। এবার ঝুলনে তোমরা কেউ নেই তো কী হয়েছে। মনে করো, কৃষ্ণ ঠাকুর তোমার সঙ্গে আছেন। সত্যি সত্যিই আছেন কিন্তু। দেখেছো তো তোমরা কষ্ট পেলে মাও কতো দুঃখ পান।

দেবদাস মণ্ডল (গ্রাম-মেটিয়ারী, পোঃ-প্রতাপনগর, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ৩৩০)

উত্তর ঃ আপনার অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়। শুকতারার প্রথম সংখ্যা এখন আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে সাহায্য করতে পারা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

অনন্যা মিত্র (প্রযত্নে—হৃষীকেশ মিত্র, পোঃ ও গ্রাম-চিনপাই, বীরভূম-৭৩১ ১০৪)

উত্তর ঃ তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে? পার্ট টু অনার্স এবার। পড়ার চাপ বাড়বে। পড়াশোনার ব্যাপারে এবার জোর দাও। ভালো থেকো।

নির্মাল্য পুরকাইত (তৃতীয় শ্রেণি, দঃ ২৪ পরগনা, দঃ দুর্গাপুর-৭৪৩ ৬১০)

উত্তর ঃ কুইজ-কুইজ বিভাগটি তোমার খুব ভালো লাগে। ঐ বিভাগ থেকে অনেক কিছু জানতে পারো জেনে আমাদেরও ভালো লাগছে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। বিজয়ার প্রাণভরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছ নিও। বাড়ির বড়দের নমস্কার জানিও। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

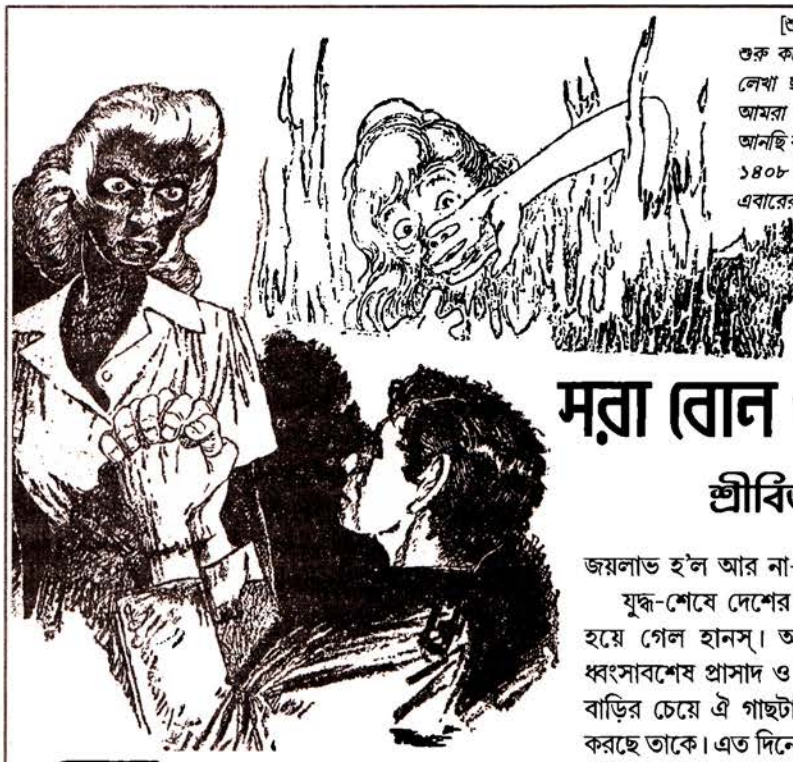

[শুকতারার বয়স ৬৭ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেরই লেখা ছাপা হয়েছে শুকতারায়। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনছি বাংলা শিশু-সাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার ১৪০৮ সালের শারদীয়া থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এবারের সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের লেখা ভৌতিক গল্প 'মরা বোন ও ভুতুড়ে পাইন'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় অর্থাৎ কার্তিক ১৩৬২ বঙ্গাব্দে। সঃ শুকতারা।]

মরা বোন ও ভুতুড়ে পাইন

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলার স্মৃতি-জড়ানো বিরাট পাইন গাছটার সামনে এসে দাঁড়াল হানস্। কী দশাই হয়েছে গাছটার! স্নিগ্ধ, সবুজ পত্র-পল্লবের কোন ঐশ্বর্য্যই আজ আর নেই তার দেহে, শুধু একটা মৃত শুষ্ক কাণ্ড হাড়গোড় বার করে দাঁড়িয়ে আছে! গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে জল এলো হানস্-এর। এই গাছের তলাতেই কবর দেওয়া হয়েছিল তার বাবা-মাকে। তাদের ছোট দুই ভাই-বোনকে রেখে মারা যান হানস্-এর বাবা ও মা—অল্পদিনের মধ্যেই, পর পর। বুড়ো দাদু ও দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিল হানস্ আর তার ছোট বোন লেনা। এই গাছের তলায় বসে দিনের-পর-দিন দাদু ও দিদিমা তাদের নিয়ে কত মজার মজার গল্পই না বলতেন! কিন্তু আজ সে দাদুও নেই, দিদিমাও নেই, আর আদরের সেই একমাত্র বোন লেনাও নেই—নেই মানে, বেঁচেই নেই নিশ্চয়! অতীতের শেষ স্মৃতি বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ঐ হাড়-বারকরা পাইন আর প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের কারুকার্য্য করা লোহার গেটটা। বোমার মারাত্মক ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ঐ গেটটা যে কেমন ক'রে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

হানস্ আর বেশীক্ষণ চেয়ে দেখতে পারল না এই ধ্বংসস্তূপ। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল; মাথা, কপাল আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল অনর্গল। এই যুদ্ধ—এই তার পরিণতি! মানুষের সংসার-সুখ, ঘর-বাড়ি যদি নষ্ট হয়ে গেল, আপনার জন আত্মীয়স্বজন যদি সবই মরে-হেজে গেল; তা'হলে আর রইল কি?—যুদ্ধে জয়লাভ হ'ল আর না-হ'ল, কি এসে-গেল মানুষের তা'তে!

যুদ্ধ-শেষে দেশের বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল হানস্। অবাক্-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রাসাদ ও আদ্দিকালের ঐ পাইন গাছটার দিকে। বাড়ির চেয়ে ঐ গাছটাই যেন সব চেয়ে বেশী আজ আকর্ষণ করছে তাকে। এত দিনের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হানস্ চারিদিকের এই নিদারুণ দৃশ্য সত্যিই যেন আর সহ্য করতে পারল না—গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। 'কোলোন'-এ থাকার সময়ই যদিও হানস্ শুনেছিল তাদের দেশে বোমা পড়ার কথা, কিন্তু এ দৃশ্য সে কল্পনা করেনি! নতুন করে এখানে ঘর বাঁধবার আর সম্ভাবনা নেই—তা ছাড়া টাকাই বা কোথা! যা ছিল, সবই জ্বলে-পুড়ে ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—প'ড়ে আছে শুধু ইট-কাঠ-লোহার বিক্ষিপ্ত ছোট-বড়ো কতকগুলো স্তূপ!

আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে, বিধ্বস্ত বাড়ির একটা খোলা অংশে গিয়ে বসে পড়ল হানস্। এখন একটু বিশ্রাম না নিলে আর চলতে পারা, এমন কি দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বেলা পড়ে এসেছিল। আকাশের গায়ে কে যেন ভুসোর ক'লি ফেরাতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যা হয় হয়। হানস্ তার হাতের রেন্-কোটটা মাথায় দিয়ে ঐ দাওয়ার উপরেই নিজেকে ছড়িয়ে দিল। এই নিরালায়, চারিদিকের এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যেই কে যেন জোর ক'রে শুইয়ে দিল তাকে।

বাল্যকাল থেকেই অসীম সাহসী ছিল হানস্, ভয় বলে কিছুই জানত না। এখানেও ভয় তার কিছুই করছিল না বটে, কিন্তু বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি-জড়ানো এই বাড়িটার দুর্নিবার একটা মায়া আস্তে আস্তে কেমন যেন তাকে অভিভূত করে ফেলছিল তন্দ্রার মধ্যে।

চোখ জুড়ে আসার মুখে, শুয়ে শুয়ে দাদু, দিদিমা ও লেনার কথা গভীরভাবে মনে পড়তেই হানস্ হঠাৎ দেখল, লেনা তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

হানস্ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'একি, লেনা তুমি! বেঁচে আছ তা'হলে?' ব'লে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সেক্‌হ্যাণ্ড করার জন্যে, কিন্তু লেনা একটু ব্যবধান রেখে সরে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমি, দাদু ও দিদিমা আমরা সবাই আছি, কিন্তু এখানে নয়, অন্য দেশে!'

হানস্ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, 'দাদু-দিদিমাও বেঁচে তা'হলে!—কোথায় তাঁরা, এখুনি নিয়ে চলো তাঁদের কাছে আমায়! কিন্তু অন্য দেশে তোমরা চলে গেছ ত' এখানে এ-সময় তুমি এলে কি করে?'

'তুমি এখানে এসেছ জানতে পেরেই আমি এলুম। এখন আমি সব জানতে পারি, সব করতে পারি ইচ্ছে করলে।' লেনা বললে গম্ভীর ভাবে।

এ-কথার তাৎপর্য্য তলিয়ে দেখার অবসর হ'ল না হানস্-এর। সে তাড়াতাড়ি বললে, সে কি অনেক দূর দেশ?'

'যত দূরই হোক নিমেষে আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব আবার নিমেষেই পৌঁছে দিয়ে যাব এখানে।' বললে লেনা।

এ-কথার উত্তরে হানস্ বিরক্তির সুরে বোকার মত বললে, 'আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে বলছ কেন? আমি আর যাব কোথায়, একসঙ্গেই ত' থাকব আমরা সবাই?'

'তোমার সেখানে থাকা হবে না হানস্—তুমি শুধু দাদু-দিদিমাকে দেখেই চলে আসবে। তাড়াতাড়ি ঐ গাছটার উপরে উঠে বসবে চলো—আমার হাতে বেশী সময় নেই।' বলে লেনা সেই পাইন গাছটার দিকে দেখিয়ে দিল।

যন্ত্রচালিতের মত লেনার সঙ্গে হানস্ শুক্‌নো পাইন গাছটার উপর গিয়ে উঠে বসল।

ওরা গাছে চ'ড়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এরোপ্লেনের মত হুস্ হুস্ করে শূন্যে চলতে আরম্ভ করল গাছটা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছটা এক জায়গায় এসে নাবতে আরম্ভ করল নীচের দিকে। নাববার মুখে লেনা বললে, 'ছেলেবেলা থেকেই তুমি ত' খুব বীরপুরুষ, কিন্তু এখানকার সব দৃশ্য দেখে ভয় পেও না যেন!' তার কথা শেষ হতে-না-হতেই গাছটা ঝুপ্ করে এনে নাবিয়ে দিল তাদের এক বিস্ময়কর দেশে। শোঁ শোঁ শব্দে অনবরতই ঝড়ের বেগে হাওয়া বইছে এলোমেলো। চারিদিকে অস্বাভাবিক রকমের গাছপালা মাইলের পর মাইল জুড়ে অন্ধকার করে রেখেছে সারা দেশটা। মধ্যে মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমিতে নানা ধরণের বীভৎস সব সরীসৃপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য রক্তপায়ী বাদুড় বিরাট বিরাট ডানা বিস্তার করে উড়ছে আর ঝটাপটি কামড়া-কামড়ি করছে পরস্পরে। ধোঁয়ার মত এক ধরণের গ্যাস উঠছে চারিদিক থেকে। জলাভূমির মাঝে মাঝে জল ফুটছে টগবগ করে।...

যত বীরপুরুষই হোক্ না কেউ, এ-দৃশ্য দেখে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। হানস্ জড়ানো গলায় বললে, 'একি ব্যাপার! এখানে না আছে মানুষ- জন, না আছে মানুষের ঘর-বাড়ি— এখানে, এ কোন্ নরকপুরীতে নিয়ে এলে তুমি আমায়! শীগ্‌গির দাদু-দিদিমার কাছে নিয়ে চলো—তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলেই আমি চলে যাব।'

হানস্-এর কথার উত্তরে লেনা এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন সবই আছে এখানে, তবে তুমি দেখতে পাবে না—দেখলে আরো ভয় পেতে!'

'আচ্ছা বেশ, এখন ওঁদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখাটা করিয়ে দাও—আর এক মুহূর্ত্তও আমি থাকতে পাচ্ছি না এখানে!' তীব্র বিরক্তি হানস্-এর কথায়।

'এসো আমার সঙ্গে।' ব'লে একটা জলার পাড়ে হানস্‌কে নিয়ে গেল লেনা। দূর থেকে ইঙ্গিত করে বললে, 'ঐ দেখ দিদিমাকে।'

হানস্ দেখলে বুড়ী দিদিমা একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হানস্ সেদিকে যাবার জন্যে চেষ্টা করতেই লেনা ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যেও না—যেও না ওদিকে, বিপদে পড়বে; তাছাড়া বুড়ী এখন মানুষও

শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রকাশিত নানা স্বাদের বই

ভবেশ দত্ত

সাধক মহাপুরুষদের অলৌকিক লীলা ১০০.০০

নটরাজন

ডানপিটে ভগবান ৬০.০০

কমল লাহিড়ী

ভক্তের ভগবান (অখণ্ড) ১০০.০০

সিদ্ধার্থ সিংহ

৫১টি ছোটদের ছোট গল্প ১৯৫.০০

সুরুচিবালা রায়

নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া ৬০.০০

সুশীল মুখোপাধ্যায়

রহস্যে ঘেরা পুরীর শ্রীজগন্নাথ ৪০.০০

ডঃ দীপক চন্দ্র

হরিবংশ (গদ্যে ভাগবত) ২৫০.০০

বরুণ দত্ত

নৈমিষারণ্য (ভ্রমণ কাহিনী) ৯০.০০

প্রবীর রঞ্জন বসু

মানবী ১৫০.০০

(প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী জাতির উপর বিভিন্ন অত্যাচারের একটি দলিল।)

সুরমা চন্দ

আধুনিক রন্ধন প্রণালী ৮০.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি.
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দূরভাষ ঃ ২২৪১-২২৪৩
ডাক ও হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে।

চিনতে পারে না, কথাও বন্ধ হয়ে গেছে!—দু'জনেরই ঐ একই অবস্থা!'...

'দাদু, দাদু কোথায়?' বলে হানস্ মরীয়া হয়ে উঠল তাঁকে দেখবার জন্যে।

লেনা আর এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ওই দেখ দাদু ব'সে বাইবেল পড়ছে এক মনে। ওরও শৈল-শকে' কথা বন্ধ হয়ে গেছে, লোক চেনারও ক্ষমতা নেই, আর কান ত' গিয়েছিল আগে থেকেই!'

'কী বলছ তুমি!' বলেই হানস্ লেনার কাছ থেকে ছুটে যেই বুড়োর দিকে যাবে, হঠাৎ দেখে বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই অন্তর্দ্ধান! কেউ কোত্থাও নেই; শুধু দুটো রক্তচোষা বাদুড় ঝটপট করে উড়ে গেল সেখান থেকে।

'হা হা হা!' বিকট ভাবে হেসে উঠল লেনা।

'এ কী সব কাণ্ড তোমার—কোথায় নিয়ে এলে তুমি...!' কথাটা সম্পূর্ণ শেষ না করেই হানস্ যেন হাঁফাতে লাগল। তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে!

হানস্-এর কাছ থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল লেনা। এই কথার পর সে হানস্-এর আরো কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে লেনাকে এখন। ক্রমশই তার স্বাভাবিক চেহারাটা বদলাতে বদলাতে এখন যেন কেমন একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে! রঙটা বদলাতে বদলাতে হয়ে আসছে যেন পোড়া কাঠের মত! যুদ্ধ-ফেরত সাহসী জার্ম্মান-সন্তান হানস্ মায়ের পেটের বোনের চেহারার এই ভয়াবহ পরিবর্ত্তন দেখে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দুটো হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে সে চীৎকার করে উঠল, 'লেনা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমায় বাঁচাও—এ আমি সহ্য করতে পারছি না!'...

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর লেনা কথা বললে। গলাটাও তখন তার অস্বাভাবিক রকম বদলে গেছে। সোজাসুজি লেনা বললে, 'শোন হানস্, তুমি ভয় পেও না, আমরা কেউই আজ আর বেঁচে নেই—সকলেই মৃত! যুদ্ধ যখন আমাদের দোরগোড়ায় এসে পড়ল, চারিদিকে যখন বোমা প'ড়ে লোক কুকুর-বেড়ালের মত মরতে লাগল 'ডুরেনে', সব যখন ধ্বংসের মুখে, আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই রইল না যখন, তখন বুড়ো দাদু ও দিদিমা নিরুপায় হয়ে আমায় অনুরোধ করলেন তাঁদের বিষ দিতে। কারণ তাঁরা দেখলেন, এ বয়সে তাঁরা বেঁচে থেকে যদি আমি ম'রে যাই ত' তাঁদের আর দুর্গতির শেষ থাকবে না, আর সেটা হবে তাঁদের মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণার। তাঁদের প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত আমি রাজী হই, এবং ঠিক করি, ওঁদের বিষ দেওয়ার পর আমি নিজেও বিষ খাব। এই ঠিক করে আমাদের যা পুরোন মূল্যবান সোনাদানা ও জুয়েলারী ছিল, যার দাম হবে প্রায় পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা, তা সবই বাগানের ঐ পাইন গাছের তলায় পুঁতে ফেলি। কিন্তু পুঁতে ফেলার আগে তার একটা লিস্ট খামের ভিতর পুরে সীল করে আমাদের পুরোন মালী লিসেনভগ্‌কে দিয়ে দিই তুমি ফিরে এলে দেবার জন্যে। লিসেনভগ্ এখান থেকে পালিয়ে যায় আত্মরক্ষার জন্যে।

'তারপর যখন সত্যিই আর আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই দেখি, তখন একদিন রাত্রে দাদু ও দিদিমাকে আমি নিজের হাতে বিষ তুলে দিই! কিন্তু সেই বিষ নিজে খেতে যাবার আগেই আমাদের বাগানের পাশে বোমা পড়ে এবং তারই ধাক্কায় আমার হাত থেকে বিষের গ্লাস পড়ে যায়। কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতে-যেতেই আবার বোমা পড়ে, এবং এবার ঠিক আমাদের বাড়ির উপরেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর হুড়মুড় ক'রে সব ভেঙে প'ড়ে আগুন জ্বলে ওঠে চতুর্দ্দিকে! আমি প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে দাদু-দিদিমার সঙ্গেই পুড়ে মরি এই বাড়িতে! উঃ, সে কী ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা!

'এখন তুমি ফিরে এসেছ দেখে, ঐ মূল্যবান ধনরত্ন যাতে তোমার হাতে পড়ে সেই খবরটাই দিতে এসেছি—থাকতে পারিনি!—আজ আমি মৃত! আমি মৃত! হানস্ আজ আমি মৃত!' ব'লে শেষের দিকে বিকট চীৎকার করে কেঁদে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল লেনা হানস্-এর চোখের সামনে। যেমন হঠাৎ তার আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি অকস্মাৎ সে মিলিয়ে গেল!

গাঢ় ঘুমের মধ্যেই ঐ চীৎকারে কর্ণপটহ যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল হানস্-এর। লাফিয়ে, ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সে। একবার ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করে দেখল চারিদিক। সে যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। সারা আকাশ কুয়াশায় ঢেকে থাকলেও তার বুঝতে বাকী রইল না যে ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই। সারা গায়ে তখনও ভীতির কাঁটা। এটা যে স্বপ্ন তা কিছুতেই ভাবতে পারছিল না হানস্। এত স্পষ্ট, চাক্ষুষ দেখার মত এত জীবন্ত কি কখনো স্বপ্ন হয়! পাইন গাছের তলায় লুকানো ধনরত্নের কথা মনে হতেই সে চাইল বাগানের দিকে। এখান থেকে সোজাসুজিই গাছটাকে দেখা যাচ্ছিল। এতে চড়েই ত' গিয়েছিল সে লেনার সঙ্গে। এখনও কিন্তু ঠিক তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে শুক্‌নো পাইনের কঙ্কালটা, যেমন ছিল আগের দিন বিকালের দিকে। লেনার কথা মত ওরই তলায় যদি পোঁতা থাকে তাদের সমূহ ঐশ্বর্য্য তা'হলে ত' সবটাই সত্যি হয়ে যায়! একবার ভাবল হানস্।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে হানস্ গাছটার দিকে যাবে বলে যেই উঠেছে, এমন সময় তার চোখের উপর ভেসে উঠল আর এক ভয়াবহ দৃশ্য। এই অদ্ভুত ভুতুড়ে গাছের কাণ্ড দেখে নিজের চোখ্‌কেই বিশ্বাস করতে পারে না হানস্। দেখে, তাদের সেই বিশ্বস্ত পুরোন মালী লিসেনভগ্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে, আর তার পিছু পিছু তাড়া ক'রে ছুট্‌ছে ঐ শুক্‌নো ভুতুড়ে পাইন! এক ভয়াবহ স্বপ্নকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেবার পূর্ব্বেই আর এক সত্য স্বপ্নের মতই ভেসে উঠল হানস্-এর চোখের সামনে!

দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে সাহসী হানস্ ভাবতে লাগল, তা'হলে কি লিসেনভগ্ সেই খাম খুলে আজই ধনরত্ন আত্মসাৎ করার জন্যে পাইন গাছের তলা খুঁড়তে এসেছিল?

—

তারক ঘোষ

ওরা আছে।

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা ট্রেনের দুলুনিতে বেশ ঘুম-ঘুম ভাব হয়েছিল। হয়তো একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। আর সেটাতেই ব্যাঘাত ঘটালেন আশুমামা। নাইটল্যাম্পের সবুজ আলোয় কামরার মধ্যে এক আলো-আঁধারি পরিবেশ। জানালা ভেদ করে আসা ঘুরন্ত চাকার একঘেয়ে আর্তনাদ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ চেনা সেই ছন্দকে ভেঙে দিয়ে আশুমামার মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল শব্দ দুটো—ওরা আছে।

আমি আর আশুমামা। টু-টায়ার কামরায় মুখোমুখি দুটো আপার বার্থে। চলেছি প্রতাপগড়। রাতের ট্রেন। ভোর নাগাদ পৌঁছে যাব গন্তব্যস্থলে। মাত্র একটা রাতের জার্নির জন্য নয়, সরাসরি প্রতাপগড় যেতে হলে এই ট্রেনটাই একমাত্র ভরসা।

এবারে শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তার উপর জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে হিমশীতল হাওয়া ঢুকে পড়ছে। বেশ শীত করছিল। তাই ন'টা বাজতে না বাজতেই রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে উঠে বসেছিলাম নিজের আসনে।

মিনিট কয়েক পরে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতেই কম্বলটা একেবারে মাথা পর্যন্ত টেনে দিলাম। একবার আড়-চোখে তাকালাম আশুমামার বার্থের দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে এমার্জেন্সি টর্চের আলোয় একমনে পড়ে চলেছেন মামা। বইটা আজ সকালেই কেনা। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে। এডোয়ার্ড লিন্টনের লেখা 'দি হন্টেড অ্যান্ড দি হন্টার্স'।

আশুমামা আমার নিজের মামা নন। মায়ের পিসতুতো ভাই। তবে আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর এমন একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল যে কোনোদিনই তাঁকে নিজের মামা ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারিনি।

আশুমামা ছিলেন মিলিটারিতে। কর্নেল পদে। কাজের চাপে ঘন ঘন আসতে পারতেন না। তবে বছরান্তে নিজের বাড়িতে এলেই দিন পাঁচ কাটিয়ে যেতেন আমাদের কলকাতার বাড়িতে। সঙ্গে আনতেন অজস্র বই। সবই প্রায় ইংরিজিতে।

বাড়ির উত্তরদিকের একটা ঘরে মামা উঠতেন। আমার বাবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রফেসর। বেশ রাশভারী মানুষ। কিন্তু, এই শ্যালকটিকে তিনি বেশ প্রশ্রয় দিতেন। বাড়িতে থাকলে জমিয়ে আড্ডাও দিতেন আশুমামার সঙ্গে। মামার অবশ্য নেশা বলতে দিনরাত বইপড়া।

মামাকে জিজ্ঞাসা করতাম, দিনরাত কী এত পড়?

মামা বলতেন, ওরা আছে কি নেই, তাই খুঁজি।

মামার এই এক অদ্ভুত নেশা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হন্টেড হাউস নিয়ে যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করা। আর অবসর পেলেই তা গোগ্রাসে গেলা।

মামার এই নেশাকে রীতিমতো পেশায় পরিণত করে দিলেন তাঁরই বাল্যবন্ধু অয়ন মিত্র।

অয়নমামা কলকাতার এক নামী বাংলা কাগজের সহ-সম্পাদক। আশুমামা চাকরি থেকে অবসর নিতেই তিনি মামাকে দিয়ে তাঁদের কাগজে একটা ধারাবাহিক লেখাতে শুরু করলেন।

এতদিন জানতাম বন্দুক-রাইফেল নিয়েই মামার কাজ-কারবার। কিন্তু বন্দুক ধরা হাতে কলমও যে আগুন

ঝরাতে পারে সেটা মামার লেখা না পড়লে জানতেই পারতাম না।

ধারাবাহিক 'ওরা নেই' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলে দিল। ভুতুড়ে বাড়ির নানা রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে টানটান উত্তেজনা মিশিয়ে সারাটা সপ্তাহ পাঠকদের বুঁদ করে রাখতেন তিনি। সপ্তাহের শেষে ভুতুড়ে বাড়ির মুখোশ খুলে দিয়ে নিরসন ঘটাতেন সেই আতঙ্ক আর উত্তেজনার। পাঠকদের বুঝিয়ে দিতেন আদপে ওরা নেই।

অয়নমামাও কাগজের সার্কুলেশন বেড়ে যাওয়ায় বেশ খুশি। হাসতে হাসতে প্রায়ই বলতেন, ওরা আছে কি নেই জানি না, তবে পাঠকরা কিন্তু আশুর সঙ্গেই আছে।

এবারে শীত পড়তেই পরিযায়ী পাখির মতো আশুমামা এসে হাজির। পুজোর সময় রাজস্থানের কোনো এক প্রাসাদে গিয়েছিলেন ভূত শিকার করতে। শিকার শেষে দেশের বাড়িতে দিনকয়েক কাটিয়ে সোজা কলকাতায়। আমাদের বাড়িতে। বিয়ে-থা না করায় মামার পিছুটানও ছিল না। দাদু-দিদা তো অনেক আগেই গত হয়েছেন।

উত্তরদিকের ঘরটাতে বসে দু'দিন ধরে চলছিল 'ওরা নেই' লেখার কাজ। তৃতীয় দিনে একেবারে সাত সকালে মামার ঘরে তলব পড়ল আমার।

খাটের উপর শুয়ে আশুমামা। চারপাশে ছড়ানো কাগজের জঙ্গল। হঠাৎ চোখ পড়ল মামার পাশে রাখা একটা ডায়েরির দিকে। বেশ পুরোনো। মলাটের ধারগুলো উই-এ খাওয়া।

আমাকে দেখে উঠে বসলেন মামা। আমিও খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসে পড়লাম।

কোলের উপর বালিশটায় ভর দিয়ে মামা বললেন, প্রতাপগড়ের নাম শুনেছিস?

আমি ঘাড় নাড়লাম, না।

মামা বললেন, তাহলে শোন। উত্তর বাংলার বিহার লাগোয়া এক আধাশহর এই প্রতাপগড়। ইংরেজ আমলে এই প্রতাপগড়ের জমিদার ছিলেন সূরজমল সিং। ভয়ঙ্কর অত্যাচারী। হিটলারের ছোট সংস্করণ। গ্রামের শেষ সীমানায়, তখন প্রতাপগড় শহর হয়নি, একটা টিলার উপর ছিল তাঁর প্রাসাদ। রবার্ট স্মিথ নামে এক ইংরেজ লেখক এই সূরজমলের অতিথি হয়ে বেশ কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন এই প্রাসাদে। ইংল্যান্ডে ফিরে কাগজে এক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লেখেন তিনি। সেই প্রবন্ধে মুখোশ খুলে দেওয়া হয় সূরজমলের।

একটু থেমে মামা আবার শুরু করলেন—প্রাসাদের মাটির নীচে এক গুমঘরে নিরীহ প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাতেন জমিদার। খাজনা দিতে না পারলে জমিদারের পেয়াদা গিয়ে তুলে নিয়ে আসত দোষী প্রজাদের। তারপর চলত অত্যাচার। জমিদারের এক ডাক্তার বন্ধু জীবন্ত মানুষদের শরীর থেকে কেটে নিতেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

চাপের মুখে পড়ে ইংরেজ সরকার সূরজমলকে গ্রেফতার করার আদেশ দেয়। যেদিন সূরজমলকে গ্রেপ্তার করা হবে তার আগের রাতেই এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় সূরজমলের প্রাসাদ। মৃত্যু হয় সূরজমলের গোটা পরিবার সহ আটক কিছু প্রজারও।

এরপর দেশ স্বাধীন হয়। সত্তরের দশকে রবার্ট স্মিথের নাতি এডোয়ার্ড গিয়েছিলেন সূরজমলের ভগ্ন প্রাসাদে। কিন্তু, সেখানেই তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। প্রাসাদের একটা ভেঙে পড়া দেওয়ালের পাশে পাওয়া যায় এডোয়ার্ডের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ে তাঁর শরীর থেকে অদ্ভুতভাবে উধাও চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড সহ বেশ কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

এডোয়ার্ডের মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল এই ডায়েরিটা। মামা সেই পুরোনো ডায়েরিটা হাতে তুলে আমাকে দেখালেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, এডোয়ার্ডের খুনিকে পুলিশ ধরতে পারেনি। এরপর গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে মোট পাঁচজন একইভাবে ওখানে খুন হয়। খুন অবশ্য পুলিশের মতে। প্রত্যেকের শরীরেই ছিল অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। প্রথমে পুলিশ ভেবেছিল অঙ্গ পাচারচক্রের কাজ এটা। কিন্তু পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ে যেভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা হয়েছে তা হাতুড়ে ডাক্তারের কাজ। যাই হোক সমস্ত ঘটনাগুলোই ছিল অদ্ভুত। গ্রামের মানুষের ধারণা এগুলো সূরজমল আর তার সেই বন্ধু ডাক্তারের কাজ।

আমি ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছিলাম এডোয়ার্ডের ডায়েরিটার দিকে। কৌতূহল চাপতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কথাটা বলেই ফেললাম, কী আছে ঐ ডায়েরিতে?

মামা সাবধানে ডায়েরির পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বললেন, এডোয়ার্ড ঐ প্রাসাদে সূরজমল আর তার ডাক্তার বন্ধুকে দেখেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, তা কী করে সম্ভব! ওরা তো বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে।

মামা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তার চেয়েও বড় কথা ওরা বেঁচে থাকলে ওদের এখন বয়স হত দেড়শো বছরের কাছাকাছি।

মামা ডায়েরিটা বিছানায় রাখতে রাখতে বলেন, জানিস বাচ্চু, সবকটা রহস্যজনক মৃত্যুই হয়েছে একুশে ডিসেম্বর রাতে। আর ঐ তারিখেই ধ্বংস হয়েছিল সূরজমলের প্রাসাদ। এটাই আমার কাছে রহস্য।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, পরশুই তো একুশে ডিসেম্বর।

হ্যাঁ, ঐদিন সকালেই আমরা প্রতাপগড় পৌঁছাচ্ছি।

আমরা মানে? আমি অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকালাম।

তুই আর আমি। তুই তো এখন কলেজে পড়িস। সাহসও আছে।

কিন্তু মা-বাবা? আমি আমতা আমতা করে বললাম।

সে দায়িত্ব আমার।

মামার মুখে শব্দ দুটো শুনে চমকে

উঠেছিলাম। তাকিয়ে দেখি মামা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নাহ, সব চুপচাপ। শুধু ট্রেনের ছুটে চলার শব্দ। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল মামার হাঁকডাকে, এই বাচ্চু উঠে পড়। পরের স্টেশনেই নামব।

চটপট বাঙ্ক থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিলাম। মামাও তৈরি। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সকাল সাড়ে ছটা।

আমরা ছাড়া আর কোনো যাত্রী বোধহয় নামবে না। তাই দরজাটাও ফাঁকা। বাইরে তাকিয়ে দেখি, ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে আছে।

ট্রেন থামতেই নেমে পড়লাম। আমার পিছনে মামা। নিচু প্ল্যাটফর্ম। জুতোর নীচে কাঁকরের অস্তিত্ব। বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। বাঁশির আওয়াজটাও কেমন অদ্ভুত। আগেকার দিনে কয়লার ইঞ্জিনে যেরকম বাঁশি বাজত। ইঞ্জিন চলার শব্দটাও ঠিক কয়লার ইঞ্জিনের। কিন্তু, এখন তো দেশের কোথাও কয়লার ইঞ্জিনে গাড়ি চলে না! পিছন ফিরে ট্রেনটাকে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখা গেল না।

মামা আর আমি প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বুকিং কাউন্টারের দিকে এগোলাম। এখানে কুয়াশা পাতলা। অবাক চোখে তাকালাম স্টেশনটার দিকে। লালরঙের ছোট্ট দুটো ঘর। প্ল্যাটফর্মের উপর দুটো গ্যাসের আলো। কোনো দোকান, ওয়েটিং রুম কিছুই নেই। যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো ছোট্ট স্টেশন। অথচ মামা বলেছিলেন প্রতাপগড় জংশন স্টেশন। ভুল স্টেশনে নেমে পড়লাম নাকি? নাহ্, ঐ তো কালো বোর্ডের উপর ইংরিজিতে প্রতাপগড় লেখা।

মামার দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনিও অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। লোকজনও কেউ নেই। হঠাৎ কালো কোট গায়ে ধুতি পরিহিত এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বুঝলাম চেকার। টিকিট বের করতে যাব, কিন্তু সেই চেকারমশাই আমাদের হঠাৎ স্যালুট করে দ্রুতপায়ে ফিরে গেলেন।

আমি আর মামা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মামার মুখেও কেমন যেন একটা ঘাবড়ে যাওয়া ভাব। মামা বললেন, চল স্টেশনের বাইরে গিয়ে অটো ধরে নিই।

বাইরে এলাম। কিন্তু এ কী অবস্থা! চারিদিক শুনশান। সিঁড়ির গায়ে দু-তিনজন দেহাতি আগুন পোয়াচ্ছে। কুয়াশা পাতলা হলেও এখনও আলো ফোটেনি। ঠান্ডাও বেশ। কিন্তু, পরিবেশটা ঠিক যেন বিকেলের মতো। সন্ধ্যা নামার আগে যেমন হয়। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম।

চারিদিক ফাঁকা। অটো তো দূরের কথা, রাস্তাই নেই। এদিক-সেদিকে দু-চারটে বড় বড় গাছ ছাড়া চারিদিক বেবাক ফাঁকা। মামা আমার দিকে তাকালেন। যেন বলতে চাইলেন এ তো অদ্ভুত ব্যাপার রে বাচ্চু।

হঠাৎ দেখি সেই চেকারমশাই। আমাদের দিকেই আসছেন। কেমন যেন কাঁচুমাচু ভাব। সামনে এসে হাতজোড় করে বললেন, হোয়্যার গো স্যার?

মামা বললেন, আপনি বাঙালি?

লোকটা মামার মুখে বাংলা শুনে যেন একটু সাহস পেলেন। হেসে বললেন, কী করে বুঝলেন স্যার?

আপনার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে।

লোকটা কান এঁটো করা হাসি হেসে বললেন, চাটগাঁ।

বাড়ি চললেন? মামা বললেন।

এই যে, বিকেলের ট্রেনটা চলে গেল। আবার সেই সকালে ট্রেন। তাই বাড়ি চললুম।

এবার মামা আর আমি দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠলাম। মাথায় বজ্রাঘাত হলেও এতটা চমকাতাম না। বলে কী লোকটা? এখন বিকেল?

লোকটা কোটের পকেট থেকে একটা চেন-বাঁধা ঘড়ি বের করে দেখে বলেন, এই তো স্যার পাঁচটা কুড়ি। তা যাবেন কোথায়? পালকি বলা আছে?

একটার পর একটা চমক। জংশন স্টেশনের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি ঐতিহাসিক প্রতাপগড় স্টেশনে। নামলাম সকালের ট্রেনে, এই লোকটা বলছে এখন বিকেল।

মামার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, মাথায় ছিট আছে। নইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পোশাক পরে একবিংশ শতাব্দীর স্টেশন সামলায়? আবোল-তাবোল বকে?

মামা এবার হেসে বললেন, সুরজমল পালকি পাঠাবেন।

কথাটা শুনেই লোকটার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল ভয় পেলে যেমন হয়। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আপনারা জমিদারমশাই-এর কুটুম্ব। আমার আগে বোঝা উচিত ছিল স্যার। অধমের ধৃষ্টতা মাফ করবেন। কথাগুলো বলেই একছুটে লোকটা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। আর দেখতে পেলাম না। সকালের আলো ফোটা দূরের কথা, একটু একটু করে যেন অন্ধকার নেমে আসছে। হঠাৎ কী মনে হতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফেললাম।

মোবাইলের সুইচ অন করতেই ভেসে উঠল সময়টা। ফাইভ থার্টি পি. এম. অর্থাৎ বিকাল সাড়ে পাঁচটা।

আমার তখন হাত-পা কাঁপছে। এখন তা হলে সত্যিই বিকেল। মামা আমার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এডোয়ার্ড তাঁর ডায়েরিতে এরকম ঘটনার কথাই লিখেছিলেন। বিশ্বাস করিনি। এডোয়ার্ডের ডায়েরি যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে। আমরা তখন ট্রেনের যে বাঁশি শুনেছিলাম, সেটা কয়লার ইঞ্জিনের। ঐসময় এই লাইনে কয়লার ইঞ্জিনই চলত। আমরা এখন অতীতে।

মামার কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম

কীভাবে এই সময়ের গেরো থেকে মুক্তি পাব।

কিন্তু, এরপর মামা যা বললেন, তাতে বুঝলাম বেঁচে বাড়ি ফেরা আর হবে না।

মামা বললেন, একটু পরেই সূরজমলের পাঠানো পালকি এসে পড়বে। আমরা সেই পালকিতে চড়ে ওর প্রাসাদে যাব।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবছিলাম। মামা ডায়েরিতে সব কিছুই পড়েছেন। আমি ভয় পাব বলে সেদিন সবটা হয়তো বলেননি।

হঠাৎ কেমন যেন সাহসী হয়ে উঠলাম। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এভাবেই হয়তো রুখে দাঁড়ায় মানুষ। মরিয়া হয়ে মামাকে বললাম, পালকিতে উঠলে তো এডোয়ার্ডের মতোই অবস্থা হবে আমাদের। কাল সকালে আমাদের কাটাছেঁড়া দেহ পড়ে থাকবে সূরজমলের প্রাসাদে। তার চেয়ে চল আশুমামা, ট্রেন ধরে পালিয়ে যাই।

মামা এই বিপদের মধ্যেও হেসে উঠলেন। বললেন, ট্রেন কোথায় পাবি রে বোকা? শুনলি তো পরের ট্রেন সকালে।

বললাম, সে তো অতীতের।

বর্তমানে ফিরবি কোন পথে?

আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, কোনো উপায় নেই?

মামা আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু দূরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, পালকি আসছে। শোন কোনো কথা না বলে পালকিতে উঠে পড়বি। তারপর দেখা যাবে।

মামার কথাকে সত্যি করে অন্ধকারের বুক থেকে বেরিয়ে এল ছয় বেহারার কাঁধে চড়ে এক কারুকার্য করা পালকি। এতকাল ছবিতেই যা দেখেছি। পালকিতে ওঠার আগে শেষবারের মতো তাকালাম স্টেশনটার দিকে। অন্ধকারের বুকে ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনটার ভূত।

পালকিতে উঠেই মামা ব্যাগ হাতড়ে বের করে আনলেন এডোয়ার্ডের ডায়েরিটা।

জীবনে কোনোদিন পালকি চড়িনি। এইভাবে অতীতের ভুতুড়ে পালকিতে যে চড়তে হবে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি। আজ অতীতে এসে এটাই যে বর্তমান তা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আর একটু পরে কী ঘটবে সেটা ভেবে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লাম।

আতঙ্কের দোলায় দুলতে দুলতে চলেছি। বাইরে শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক। কতক্ষণ সময় কেটেছিল জানি না। একসময় বুঝলাম পালকিটা নামানো হয়েছে। মামা ফিসফিস করে বললেন, একুশে ডিসেম্বরের রাত।

পালকি মাটিতে নামানোর পর মামা বেরিয়ে এলেন। পিছনে আমিও। দেখলাম একটা ঘরের মধ্যে পালকিসুদ্ধু আমাদের নামানো হয়েছে। ঘরের চার কোণে চারটে জ্বলন্ত মশাল। নাকে এল একটা তীব্র দুর্গন্ধ। ঘরের মধ্যে ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছে। এত ঠান্ডা, মনে হচ্ছে ঠান্ডাতে জমেই মৃত্যু হবে আমাদের। তীব্র ঠান্ডা আর পচা দুর্গন্ধে অসাড় হয়ে আসতে লাগল আমার মস্তিষ্ক।

পালকিতে আসার পথে মামা চুপি-চুপি আর একটা কথা বলেছিলেন। একুশে ডিসেম্বর সূরজমলের প্রাসাদে কেউ আসতে চাইলে তার জন্য পালকি পাঠায় সূরজমল।

পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মামা এডোয়ার্ডের ডায়েরিটার উপর শিশি থেকে কী যেন ঢাললেন।

হঠাৎ ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে আমাদের সামনে নিরেট দেওয়ালটা সরে গেল। তাকিয়ে দেখি, দেওয়ালের ফাঁকা অংশ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে রাজা-রাজড়াদের পোশাক পরা দুজন মানুষ।

সূরজমল আর তার ডাক্তার বন্ধু। কানের কাছে মামার ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

ভালো করে তাকাতে দেখলাম ডাক্তারের হাতে একটা বড় ট্রে। তার উপর ঝকঝকে ছুরি-কাঁচি। মশালের লালচে আলোয় ঝলসে উঠছে। বুঝলাম এটাই জীবনের শেষ রাত। পা-দুটো নাড়তে গিয়ে দেখলাম অবশ।

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওদের চোখগুলো যেন শিকারি বেড়ালের মতো ধকধক করে জ্বলছে।

বাঁচার পথ বলে গেছেন এডোয়ার্ড, কাল রাতে, মামার কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ মামার হাত থেকে ওদের দিকে ছুটে গেল এডোয়ার্ডের জ্বলন্ত ডায়েরিটা। এক প্রাণঘাতী আর্তনাদে গোটা ঘরটা কেঁপে উঠল। বিস্ময়ে দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে সূরজমল আর তার ডাক্তার বন্ধু। পুড়তে পুড়তে কালো হয়ে যাচ্ছে তাদের শরীর। হঠাৎ গোটা ঘরটা কাঁপতে শুরু করল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। মামা আর আমি ছুটতে শুরু করলাম দরজার দিকে। তীব্র এক বিস্ফোরণ। আর কিছু মনে নেই।

সম্বিৎ ফিরতে দেখি দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের দরজায়। হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন। প্ল্যাটফর্মের উপর হলদে বোর্ডে লেখা প্রতাপগড় জংশন।

মামা পিছন থেকে বললেন, চল নামি। আমার ঘোর তখনও কাটেনি। বললাম, এতক্ষণ তাহলে কোথায় ছিলাম?

প্ল্যাটফর্মে তখন যাত্রীদের ভিড়। ওঠা-নামার ব্যস্ততা। মাইকে ঘনঘন ঘোষণা। হকারদের চিৎকার। ভিড় ঠেলে একটু এগিয়ে গিয়ে মামা বললেন, ওটাই সত্যি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ।

অবাক কাণ্ড। ঘড়ির ডায়ালে জ্বলজ্বল করছে বাইশে ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে ছটা। প্ল্যাটফর্মেই শুনেছিলাম গত রাতে সূরজমলের সেই ভগ্ন প্রাসাদ আশ্চর্যভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সেদিন বিকালের ট্রেনেই ফিরে এসেছিলাম কলকাতায়। বাড়ি ফিরে সেই সপ্তাহেই মামা লেখাটা পাঠিয়ে দিলেন অয়নমামার কাগজে। তবে ধারাবাহিকের টাইটেলটা বদলে দিলেন। লিখলেন, ওরা আছে।

—

ছবি ঃ সুবল সরকার

আমরা বলছি

ঘূর্ণী উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

[স্কুল-পরিচিতি ঃ কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে, জলাঙ্গী নদীর পাড়ে প্রাচীন জনপদ ঘূর্ণী। এখানকার মাটির পুতুল জগৎবিখ্যাত। এখানেই শিক্ষার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান শরৎ পণ্ডিতের চালাঘরের পাঠশালা এখন এক মহীরুহ—"ঘূর্ণী উচ্চ বিদ্যালয়—উঃ মাঃ"। বিদ্যালয়ের বর্তমান বয়স ৮০ বৎসর, স্থাপিত ১৯৩৪। এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত বিভাগ ছাড়াও "রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়—মাধ্যমিক" ও কারিগরি শিক্ষার (ভোকেশানাল) ব্যবস্থাও আছে। এন-সি-সি ও খেলাধূলার জন্যে আছে বিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠ। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলাতেও এই বিদ্যালয়ের বিশেষ সুনাম আছে। জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। এই স্কুলে ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠন ও প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়মিত উদ্যান পালন, সাহিত্যচর্চা, অঙ্কন, গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির অনুশীলনও হয়ে থাকে।]

প্রথম

"জীবনের সার্থকতা পরিবেশ নির্ভর,
নির্মল অঙ্গনে সবকিছু মনোহর।"

গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, আলো, শব্দ, উত্তাপ, জল, বায়ু, মাটি, সর্বোপরি মানুষের তৈরি ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা—এই-সবকেই এককথায় পরিবেশ বলা হয়। পরিবেশ হল প্রাণের ধারক। পরিবেশের উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ, যে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। যন্ত্রযুগের বিষবাষ্পে এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাতে এই পরিবেশ এখন ক্রমে ক্রমে দূষিত হচ্ছে। বিষিয়ে উঠছে বায়ু, নিভে যেতে বসেছে সভ্যতার আলো। পরিবেশ দূষিত হলে যে এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে এবং জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে—মানুষ এখন তা অনুভব করছে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য অনেক আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছে, সভ্যতাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে এসেছে কিন্তু মূলত এই বিজ্ঞানের কারণেই পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেমন কেবল তার স্বার্থেই প্রকৃতিকে কাজে লাগাচ্ছে, ফলস্বরূপ তেমনি বিভিন্ন দুর্যোগ

বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষের প্রতি হয়ে উঠছে প্রতিশোধ পরায়ণ।

মানুষ আবিষ্কার করে চলেছে কতশত যন্ত্রপাতি, ব্যবহার করছে প্রযুক্তিবিদ্যা—যার মূল লক্ষ্য আরও বৈভব, আরও আধিপত্য। বার বার মানুষ লিপ্ত হচ্ছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। এগিয়ে যাবার দুর্নিবার আকর্ষণে ভুলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন কেটে বসতি গড়ে উঠছে, অর্থের লোভে যথেচ্ছভাবে গাছ কাটছে, দ্রুত শিল্পায়নের জন্য একের পর এক কলকারখানা স্থাপন করছে। শহরের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য মানুষ সবুজের সমারোহে পূর্ণ গ্রামকে করছে সংকুচিত। যার ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং'' হচ্ছে এবং এই "গ্লোবাল ওয়ার্মিং'' পরিবেশে সংকট সৃষ্টি করছে। তাছাড়াও বিচার-বিবেচনা না করে তুলছে গগনচুম্বী অট্টালিকা। জন্ম নিচ্ছে নতুন বস্তি এলাকা, ঝুপড়ি ইত্যাদি। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজের সুখ, বিলাস, বৈভবের চিন্তায় সবাই মগ্ন। আমাদের নিজেদের ঘরের বাইরেটা বা চারপাশটা কতটা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন সেদিকে আমাদের কারও খেয়াল নেই। কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় চারিদিক হচ্ছে আচ্ছন্ন। বিভিন্ন রকমের শব্দে তৈরি হচ্ছে অনিষ্টকারী কম্পন, যেমনঃ কলকারখানার শব্দ, যন্ত্রদানবের বিচিত্র হর্ন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজি-পটকার আওয়াজ। এমনকি সড়ক ও শহরের পথে যানবাহনের বিকট আওয়াজে অনেকে শ্রবণশক্তি পর্যন্ত হারাচ্ছে। পরিত্যক্ত আবর্জনার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। যানবাহনের কালো ধোঁয়া পরিবেশকে করে তুলছে দূষিত। সব মিলিয়ে আমাদের চারপাশের পরিবেশ দ্রুত শুধু বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে না—মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করতে উদ্যত হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সবকটা দেশই আজ এই ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন, এমনকি কয়েকটি দেশের নদনদীর জলও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ভারতের প্রাণ-স্বরূপিণী গঙ্গার জল শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পারমাণবিক গবেষণা, পরীক্ষা ও প্রয়োগের বিভীষিকা। অতি শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার ব্যবহার শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেখিয়েই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি। আজও ভূমি-জলাশয় প্রকম্পিত করে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত করে তুলছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। প্রকৃতির নিজস্ব কিছু দূষণকারী আচরণও আছে, যথাঃ উল্কাপতন, মহাজাগতিক রশ্মির জটিল প্রভাব, সূর্যরশ্মির তারতম্য ইত্যাদি। এগুলিও পরিবেশের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সার্বিক দূষণের প্রতিকারের জন্য এগিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের জন্য চিহ্নিত করেছে।

আমরা যদি যথোপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে সংযত জীবনযাপন করি তবে পরিবেশ দূষণ সমস্যা আমাদের বিব্রত করতে পারবে না। অর্থ ও ক্ষমতা আছে বলেই যথেচ্ছভাবে এখানে-সেখানে কারখানা গড়ে তুলব—তীব্র বেগে তীক্ষ্ণ হর্ন বাজিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ি চালাব—এটা আর যা-ই হোক না কেন, মানবিক আচরণ নয়। গঙ্গাকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করব—আবার তাতে, মলমূত্র, আবর্জনা, মৃতদেহ ইত্যাদি নিক্ষেপ করে কলুষিত করে তুলব—এটা নিশ্চয় সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। সংবাদপত্র, টি. ভি., রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে প্রতিকারের প্রচার বাড়াতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও সচেতন হতে হবে। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ রোধ করার জন্য সরকারি আইন কঠোর-ভাবে বলবৎ করতে হবে। শব্দদূষণের ব্যাপারে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মানতে হবে। বনসৃজনের গুরুত্ব দিতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতেও যাতে দূষণ না ঘটে সেদিকেও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

ছাত্রসমাজকে নতুন প্রজন্মের ধারক ও বাহক বলা হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ দূষণের সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করলে অনেকাংশে পরিবেশ দূষণ কমবে। আধুনিক ছাত্রসমাজ বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে পারে।

আমাদের পরিবেশ থেকে ক্রমেই বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক বৃক্ষছেদন হওয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টির জন্য বনবৃদ্ধির প্রয়োজন, তা না হলে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হবে না। তাই আমাদের তথা ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করতে হবে, স্কুল-প্রাঙ্গণ এবং বাড়ির আশেপাশে এবং যেকোনো ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমবে। তাছাড়া "বনমহোৎসব'' ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের প্রচার বাড়াতে হবে।

আমরা ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় স্কুলে অনেক কিছু খাওয়ার পর তার প্যাকেট ও অন্যান্য কাগজ, পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল স্কুলের চারপাশে ফেলে দিই নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে। এই সব অপাচ্য ও পাচ্য দ্রব্যগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ ডাস্টবিনে ফেলতে হবে এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে হবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন প্রচার অভিযান চালনা করতে পারে।

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জীবন নিয়ে, সমাজ নিয়ে কী ভাবছে? তাদের জীবনের লক্ষ্যই বা কী? এইসব বিষয় নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন বিভাগ **আমরা বলছি**। তোমাদের পাতার এ এক নতুন সংযোজন। শুধুমাত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই বিভাগে অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমরা কয়েকটি বিষয়বস্তু রেখেছি। এবারের বিষয় ছিল **পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকারে ছাত্রসমাজের ভূমিকা**। সেরা লেখা দুটি এ সংখ্যায় প্রকাশিত হল। পুরস্কারমূল্য ৫০০ ও ৩০০ টাকার বই।

উপসংহার আমাদের পরিবেশ যদি মালিন্যমুক্ত হয়, তবে পৃথিবীর এই সভ্যতাও সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। এর জন্য চাই সর্বজনীন শিক্ষা ও সচেতনতা। অন্যথায় "সুন্দর কুসুমিত মনোহরা" ধরাই একদিন "জরা ও মৃত্যুর-ভীষণা" ধরায় পরিণত হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে—

"জীবন সুন্দর হয়, পরিবেশ গুণে,
মানুষ মানুষ হয়, পরিবেশ জ্ঞানে।"

সুজয় বিশ্বাস
দশম শ্রেণি

দ্বিতীয়

আবহাওয়ার অনুকূল পরিবেশে একদিন এই পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন বায়ু-মণ্ডলে ছিল প্রাণের প্রস্তুতি—অফুরন্ত অক্সিজেন, খাদ্য ও জলে ছিল সতেজ বিশুদ্ধতা; যার ফলে জীবনের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এই পৃথিবীতে। এল উন্নত মস্তিষ্কের মানুষ। সূচিত হল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তার অবিরাম সংগ্রাম। এখন নির্বিচারে প্রকৃতি সংহার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন আবহাওয়া দূষণের মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে ডেকে এনেছে অবক্ষয় ও মহামারি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল
পরমায়ু।"

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যে সংকট দেখা দিয়েছে। জীবনযাপনের জন্য আমরা হাতের কাছে পেয়েছি অজস্র উপকরণ— অত্যাধুনিক কম্পিউটার, অজস্র বড়ো বড়ো কলকারখানা, দ্রুতগামী যানবাহন, পারমাণবিক মহাশক্তি প্রভৃতি। এ-গুলির জন্য আমরা উপেক্ষা করেছি পরিবেশকে।

পরিবেশের এই ভারসাম্যহীনতার ফলে বর্তমানে আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। বর্তমান সমাজে এই ভারসাম্যহীনতার প্রতিকার অবশ্যই দরকার। এজন্য পৃথিবীর সমস্ত স্তরের মানুষেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছাত্রসমাজই হল ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড। তাই সমাজ তথা গোটা পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ খুবই জরুরি। তাই ছাত্রছাত্রীদের করণীয় বন সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন মহলে দাবি জানানো। এছাড়াও তারা পরিকল্পিতভাবে রাস্তার ধারে, বিদ্যালয়ে কিংবা পোড়ো জমিতে বৃক্ষরোপণ করে সবুজের অভিযান চালিয়ে পরিবেশকে অনেকটা সতেজ করে তুলতে পারে।

পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের খাদ্যচক্রে যে সমস্যা প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে সে সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা অত্যন্ত কম কিন্তু ছাত্রসমাজ এ সম্পর্কে অবগত থাকে তাই তাদের দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন পাড়াগ্রামের অশিক্ষিত অসচেতন মানুষদের মধ্যে পরিবেশ দূষণের কুফলগুলি তুলে ধরতে হবে। চাষবাসের ক্ষেত্রে অত্যধিক হারে কীটনাশক প্রয়োগ করা যে কতটা ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে চাষিদের জানানো প্রয়োজন।

একটি বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে, এই পৃথিবীতে আমরা সবাই সুস্থভাবে বাঁচতে চাই। কিন্তু সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ যে অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমরা এখনো সবাই অসচেতন। এ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তারা বয়সে তরুণ, তাদের দেহ ও মনে আছে অদম্য প্রাণশক্তি। তারা এই আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে চলুক। তারা এগিয়ে এলে, চারপাশের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুললে হয়তো প্রকৃতিকে এই অসুস্থ অবস্থা থেকে নির্মলরূপে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সুদেব বিশ্বাস
দ্বাদশ শ্রেণি

ভূত কয় প্রকার?
দেব সাহিত্য কুটীরের
ভূতের গল্প সবার সেরা

শুকতারার ১০১ ভূতের গল্প
১ম ও ২য় খণ্ড প্রতিটি ২০০.০০
ভূত পেত্নী দত্যি দানা
৭০.০০
ভূত পেত্নী রক্তচোষা
৮০.০০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
সেকালের ভূত একালের ভূত
২০০.০০
মানুষ থাকলে ভূতও থাকে
২০০.০০
ড. গৌরী দে
৭ ভৌতিক সংকলন
২০০.০০
হাঁড়-কাঁপানো ভূত-প্রেতের গল্প
৭০.০০
গভীর রাতের বিভীষিকা
৭৫.০০
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প
৫৫.০০
ড্রাকুলা ও ভ্যাম্পায়ের গল্প
৭০.০০
গা ছমছমে ভূতের গল্প
৪০.০০
বারো ভূতের গপ্পো
৪০.০০
রাত তখন বারোটা
৪০.০০
রক্তকালীর মাঠ
৪৫.০০
ভূতেরা ভয়ঙ্কর ২৬.০০
মানবেন্দ্র পাল
ভৌতিক অমনিবাস
২২৫.০০
আতঙ্ক ৩৫.০০
জীবন্ত কঙ্কাল ৪০.০০
অশরীরী আতঙ্ক ৩৫.০০
ডা. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
দার্জিলিং মেলের অশরীরী
৫০.০০
মণিলাল মুখোপাধ্যায়
মানুষ দুখীরাম ভূত শান্তিরাম
৬০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৪২৯৪, ৪২৯৫, ৭৮৮৭

আমার বাড়ি

ডাঃ প্রকাশরঞ্জন দাশ

"বাবা, তোমাদের বাড়ি যেতে ক'ঘণ্টা লাগবে?" ছেলে পিকলুর প্রশ্নে মনে মনে সামান্য আহত হন সৌমেন্দু। নিজের দাদুর বাড়ি, বাবার হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার স্মৃতির টুকরো ছড়ানো পরিবেশকে আপন ভাবতে শেখেনি কলকাতার নামকরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলপড়ুয়া এগারো বছরের ছেলে। কারণটা অস্পষ্টও নয়, ওর মা প্রায়শই তোমার মা, তোমাদের গ্রাম, তোমার ভাইপো বলে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বাঁকা উক্তি করে। পিকলুর উপলব্ধি তার চেয়ে কীই বা বেশি হবে। অনেক বছর পর সে চলেছে গ্রামের বাড়ি। খুব ছোটবেলায় আসা সেই স্মৃতি আজ অস্পষ্ট। সারা বছর ইউনিট টেস্ট, হাফ ইয়ার্লি, অ্যানুয়াল পরীক্ষা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার প্রস্তুতি নিতে, বিভিন্ন বিষয়ে নিযুক্ত গৃহশিক্ষকের চাপ সামলাতে তার প্রাণান্তকর অবস্থা, স্কুলের বড় ছুটিতে ভারত অথবা বিদেশের নানা জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করা থাকে। বাবা, মা দুজনের ছুটির সঙ্গে তার স্কুলের ছুটি অ্যাডজাস্ট করে ঠাকুমা, পিসি, জেঠুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। মশা, সাপ, ব্যাঙ অধ্যুষিত বিদ্যুৎহীন গ্রামে যাবার ব্যাপারে সে ও তার মা কোনোদিন উৎসাহ দেখায়নি। সেদিন ঠাকুমা ফোন করে জানান যে বেশ কিছুদিন হল গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, বাড়িতে লাইট, ফ্যানের ব্যবস্থা হয়েছে, তাঁর খুব ইচ্ছে পিকলুকে একবার দেখার। ক্লাস সেভেনে উঠলেও পিকলুর স্কুল শুরু হতে সপ্তাদুয়েক বাকি। টিউটোরিয়াল যদিও চলছে সমানে। শুক্রবার ভোরে কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে গণদেবতা এক্সপ্রেসে চেপে বসেছে বীরভূমের কল্যাণপুর নামক এক গণ্ডগ্রামে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ. সি. কামরায় পাশাপাশি বসে দু'পাশের সরে যাওয়া ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে চলেছে বাবা-ছেলে। থার্মোকলের কাপে কফিতে চুমুক দিয়ে চশমার ভেতরের চোখ তুলে পিকলুর প্রশ্ন।

মনে কষ্ট পেলেও সেটা প্রকাশ করেন না সৌমেন্দু।—"আমরা যাব কোপাই স্টেশন থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরের গ্রামে। এ ট্রেনটা কোপাই দাঁড়ায় না। তাই আমরা বোলপুরে নেমে যাব ন'টা নাগাদ। তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি। আমরা বোলপুরের রেলওয়ে ক্যান্টিনে ব্রেকফাস্ট সেরে নেব। ভালো স্যান্ডুইচ বানায় ওরা।"

"তার মানে তোমাদের বাড়ির কাছের স্টেশনটা দেখা হবে না?"

সৌমেন্দু হেসে ফেলেন—"ওটা দিয়ে আমরা যাতায়াত করতাম, কিন্তু বাড়ির একেবারেই কাছাকাছি নয়।"

"বাড়ি থেকে কীভাবে আসতে?"

"সাইকেলে, স্টেশনের পাশে একটা দোকানে রাখা থাকত।"

"অতটা রাস্তা সাইকেলে?"

"কী করব, বাস যোগাযোগ বিশেষ ছিল না যে!"

একটুক্ষণ জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে পিকলু বলে, "আমার স্টেশনটা দেখতে ইচ্ছে করছে। ট্যাক্সিটাকে ওদিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

"না, বাস রাস্তাটা অন্যদিক দিয়ে। আর একটা উপায় আছে। বোলপুরে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে একটা বর্ধমান-রামপুরহাট লোকাল ট্রেন পাব। সে ট্রেনে দুটো স্টেশন। তুই কী লোকাল ট্রেনে চেপে যেতে পারবি? হয়তো বসার জায়গা মিলবে না, কামরাগুলো বড় একটা পরিষ্কার নয়।"

"দুটো তো মাত্র স্টেশন, চলো কোপাইতে নামব। একটু অন্যরকম করে বেড়াতে ইচ্ছে করছে।"

"তবে দাঁড়া, আমি ফেলুকে একটা ফোন করে দিই।"

'ফেলুটা আবার কে?" পিকলুর বিরক্তিমাখা প্রশ্ন।

"অমন করে বলতে নেই। ও তোমার জ্যাঠতুতো দাদা। বোলপুর স্টেশনে আমাদের নিতে আসার কথা ওর। আমরা যে কোপাইতে নামব, সেটা ওকে জানানো দরকার।" বাবার নরম অথচ সামান্য তিরস্কার মেশানো কণ্ঠ, পিকলু একটু অপ্রতিভ হয়।

চলন্ত ট্রেনে মোবাইল টাওয়ার সবসময় পাওয়া যায় না। ব্যান্ডেল ছেড়ে গাড়ি কিছুদূর এগোলে যোগাযোগ করা গেল, ওপারের গলাও পিকলুর কানে আসে।

"ঠিক আছে, পিকলু কোপাই নামতে চাইছে, এ তো দারুণ খবর। লোকাল ধরে দশটায় পৌঁছে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা ওখানেই থাকব। বাড়ির সবাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

বোলপুর স্টেশনের ব্রেকফাস্ট সত্যি সুন্দর। আরো সুন্দর চারদিকের পরিবেশ। টিকিটঘর, ওয়েটিং রুম বা অফিসের দেওয়ালে চমৎকার মুরালের কাজ। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার অনুকরণে তাঁর বিভিন্ন কবিতা বা গানের লাইন। পিকলু ভাবে কবিগুরু এই স্টেশন দিয়ে কতদিন যাতায়াত করেছেন! কিছুক্ষণের মধ্যে লোকাল ট্রেনটি এসে গেল। সত্যি, বেশ দৈন্যদশা ট্রেনটির। বেশ ভিড়, কিন্তু পিকলুকে দেখে কয়েকজন নিত্য অফিসযাত্রী একটু আগু-পিছু করে বসে তার বসার জায়গা করে দিল। ধিকিড় ধিকিড় করে ছুটলেও দুটো স্টেশন যেতে বেশি সময় নিল না।

কোপাই স্টেশন পুরোটা কংক্রিটের নয়। শুধু লাইনের দিকের ধারটা বাঁধানো, ট্রেন থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে ঘাসের ওপর পা রাখা যায়। রুকস্যাকের মতো ব্যাগে জামাকাপড়, এনিড ব্লাইটন, আর আধখাওয়া মিনারেল ওয়াটারের বোতল পিঠে নিয়ে পিকলু একটু লাফিয়ে ঘাসের ওপর নামল ট্রেন থেকে। পেছনে সৌমেন্দু। আরো গুটিকয়েক যাত্রী নেমেছে, যার মধ্যে আদিবাসী মহিলা, আর বাচ্চাও আছে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে মন ভরে গেল যেন। গোল গোল বাঁধানো বেদির মধ্যে কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। কোনোটা টকটকে লাল, কোনোটা গেরুয়া ধরনের লাল ফুলে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নীল-সাদা আকাশের গায়ে। কিছু বেদির মধ্যে আবার হলুদ ফুলের সম্ভার।

পিকলু তাকিয়ে দেখে বছর বাইশ-তেইশের একজন শক্তসমর্থ তরুণ তার দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে আরো চার- পাঁচজন। টিপ করে বাবাকে প্রণাম করে বাবার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে নেয়, তারপর পিকলুকে জড়িয়ে ধরে।—"আরে পিকলু, তুই এত লম্বা হয়ে গেছিস, আর ক'বছরের মধ্যে তো আমার সমান হয়ে যাবি।"

সুবল চন্দ্র মিত্রের

Pocket Dictionary English to Bengali & English

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা ভেবেই নানারূপ সংশোধন এবং পরিমার্জিত করে এই অভিধানটির নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইটির আকার সকলের ব্যবহারের পক্ষেও লোভনীয়। প্রায় একুশ হাজার-এর বেশি শব্দের সংকলন। সুন্দর হরফে ঝরঝরে ছাপা...মজবুত বাঁধাই... আকর্ষণীয় গেট-আপ। প্রতিটি শব্দের বাংলায় উচ্চারণ দেওয়া আছে, এবং বাংলা অর্থের সঙ্গে আছে যোগ্য ইংরেজি প্রতিশব্দ।
এছাড়া এই অভিধানটির বিশেষ কার্যকরী ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হল ঃ

1. Abbreviations.
2. Word-collection.
3. Diminutives.
4. Group-Verbs.
5. Proverbs, Idioms & Phrases.
6. Words likely to be confused.
7. Words commonly mis-spelt.
8. Hints on writing good English.

মূল্য—দুশো টাকা

বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত

হরিবংশ

২৫০.০০

(ডঃ দীপক চন্দ্রের ভূমিকা সহ)

রঙিন ছবি সহ সম্পূর্ণ পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সম্বলিত শ্রীমদভাগবত। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ঘটনাগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত-ভাবে বিশ্লেষণ করার সাহস এবং ক্ষমতা তাঁর বিভিন্ন রচনাতে দেখিয়েছেন ডঃ দীপক চন্দ্র।
এই শক্তিশালী লেখকের কয়েকটি বই—

কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন—	৪৫.০০
এবং অশ্বত্থামা—	৩৫.০০
কাশ্যপেয়—	২৭.০০
কালচক্র—	২২৫.০০
Krishna in Indraprastha—	৭০.০০

আজই আপনার নিকটতী দোকানে খোঁজ করুন বা লিখুন।
(ডাক ও হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে।)

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি.
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দূরভাষ ঃ ২২৪১-২২৪৩

জড়ানোর চোটে পিকলুর চশমা খুলে পড়ে যাবার উপক্রম। একটু বিরক্ত হয় সে। বাবা বলে ওঠেন—

"ও তোমার দাদা পিকলু, প্রণাম কর।"

"না, না, কিচ্ছু করতে হবে না তোকে।" পিকলুর দু'হাত চেপে ধরে ফেলু বলে, "বাড়িতে সবাই তোকে দেখবে বলে বসে আছে।"

বলতে বলতে চার-পাঁচজন বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করতে লেগে গেল।

"আরে এরা কোথা থেকে এল? ইমলি, ঝিমলি তোরাও এসেছিস!" বাবা প্রশ্ন করেন হুবহু একরকম দেখতে একইরকম জামা পরা দুই কিশোরীকে।

"হুঁ, ভাই আসছে এতদিন পরে, আর আমরা গুসকরা থেকে এইটুকু আসতে পারব না মামা!"

"পিকলু, ওরা তোমার ছোট পিসির মেয়ে। টুইন বুঝতেই পারছ।"

"আর আমি হলাম তোমার বড় পিসির ছোট ছেলে।" পিকলুর থেকে একটু বড় ছেলে হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে।

"ডাবলু, তুই তো সিউড়ি থেকে চলে এসেছিস? স্কুল নেই?"

"কী যে বল ছোটমামা, মার্চের থার্ড উইকের আগে ক্লাসই আরম্ভ হবে না।"

"গতবার তোদের স্কুল থেকে মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল না?"

"হ্যাঁ, নাইনথ।"

ফেলু বলে ওঠে, "টিকলুও আসতে চাইছিল, গাড়িতে জায়গা হত না তাহলে।"

"টিকলুদা তোমার মেজ জ্যাঠার ছেলে।" পিকলুর কাছে বাবা পরিষ্কার করে দেন, তারপর বলেন, 'তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না।"

বাবার প্রশ্নে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক ছেলেটি প্রণাম করে হাসি-মুখে দাঁড়ালে ফেলু জানায়, "ও তারক জেঠুর ছেলে পার্থ। ওর গাড়িতেই এসেছি আমরা, ওই চালিয়ে এনেছে। আমরা সবাই ঐ গাড়িতেই ফিরব।"

"তুমি তারকদার ছেলে? গাড়ি কিনেছ? বাঃ খুব ভালো।"

"ভাড়া খাটাই। আপনি আসবেন বলে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালিয়ে এসেছি আপনাদেরকে নিতে।" বলেই পিকলুর ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায়।—"আমায় দাও, আমি নিই।"

"না না, আমার অভ্যেস আছে।"

"তা তো বটেই, কত নামী স্কুলের ফার্স্ট বয় তুমি। বইপত্রের রাশি বইতে হয় রোজ, তাই না।"

পিকলু ভাবে পরিচয়হীন একজন তার সম্বন্ধে কত জানে। সবাই টিকিট ঘরের পাশ দিয়ে রাস্তার দিকে এগোয়। গাড়িটা একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাস্যাডার। অবিকল বাবার অফিসের গাড়ির মতো। তার মধ্যে গাদাগাদি করে এতজন বসা। কলকাতায় এমনভাবে যেতে হলে পিকলু গাড়িতে চড়তই না। পরিবেশের তারতম্যে কষ্টকর হলেও অসহ্য লাগছে না ব্যাপারটা। যেতে যেতে মুখোমুখি পড়ল একটা বাস, কোনো নম্বর নেই। বোলপুর-তরুলিয়া হাট লেখা। ছাদের ওপর অনেক লোক বসে, সঙ্গে হাঁস-মুরগিও আছে।

ফেলুদা গাইডের ভূমিকা নিয়ে বোঝায়—"জানিস পিকলু! কলকাতার মতো এখানে বাসের কোনো নম্বর নেই, কিন্তু আলাদা আলাদা নাম আছে। এই বাসটার নাম 'হোসেন', কোনোটা 'মা সন্তোষী', কোনোটা 'জটাধারী' আর কোনোটা 'গঙ্গা-যমুনা'। এখানকার যাত্রীরাও বলে 'বিশ্বকবি' চেপে যাব, কিংবা 'জিমি'তে চলুন এই সব আর কী!" হাসতে হাসতে বলে।

"আমরা তো কাল 'বিধাতা' চেপে এসেছি।" ডাবলুর সংযোজন।

আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি এসে যায়, পাশাপাশি দুটো বিশাল দোতলা পাকাবাড়ি, সামনেরটা পেরোবার সময় বাবা বললেন, "পিকলু, আমার জ্যাঠার ছেলেরা এই বাড়িতে থাকে, আমরা পরে এখানে আসব।"

বলতে বলতে গাড়ির আওয়াজ শুনে সবাই হৈ-হৈ করে এগিয়ে আসে। দুই জেঠু, জেঠিমা, তাদের বড় বড় ছেলেমেয়েরা, কাজের লোক, রান্নার মাসি, বেশ কয়েকজন মুনিষ, মান্দের সবাই অভ্যর্থনায়। পিকলু গাড়ি থেকে নেমে বাবার নির্দেশমতো বড়দের প্রণাম করতে যায়, বড় জেঠু আগেই বুকে জড়িয়ে ধরেন, "কাউকে প্রণাম করতে হবে না। শুধু ঠাকুমাকে করলেই হবে, কেমন! কত বড় হয়ে গেছিস রে পিকলু।"

পিকলু তাকিয়ে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন সাদা শাড়ি পরা একজন বয়স্কা মহিলা। মাথার চুল সব সাদা, ঝুঁকে হাঁটছেন, কিন্তু আভিজাত্য আর ব্যক্তিত্বের ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট।

বাবা বললেন, "পিকলু, উনিই তোমার ঠাকুমা।" পিকলু প্রণাম সারতেই উনিও জড়িয়ে ধরলেন।

"এ তো অবিকল সোমেন রে। হুবহু এইরকম ছিল তোর বাবা। এতদিন আসিসনি কেন? নিজের বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছা হয় না? ক'দিন থেকে যাবি তো বাবা?"

"না, না, রবিবার ফিরব। সোম-বার বিকেলে আমার টিউটোরিয়াল আছে যে।"

'সে কী রে! ক্লাস সেভেনে তোর টিউটর লাগছে? কেন! সোমেন তোকে পড়ায় না?" ঠাকুমার চোখ বড় বড়।

"বাবা অফিসের চাপে সময় পায় না, আর মাও তো থাকে না, তাই।" পিকলুর সলজ্জ উত্তর।

"আহা রে বাছা, তাও তো শুনি তুই ক্লাসে ফার্স্ট হোস।" পিকলু

আরো লজ্জা পায়, সে ভেবেছিল চিরদিন গ্রামে কাটানো ঠাকুমার সঙ্গে না জানি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। অত্যন্ত সহজ আলাপচারিতায় জড়তা কেটে গেল।

একজন বছর পঁচিশেকের সুশ্রী তরুণী এসে পিকলুর হাত ধরে বলে, "আমি শিউলি, তোর বড়দি। এখন চল জলখাবার খাবি সবাই মিলে, তোরা আসবি বলে আমরাও সকাল থেকে খাইনি রে।"

পিকলু বলে, "কিন্তু আমরা তো বোলপুর স্টেশনে ব্রেকফাস্ট করে এসেছি।"

"ধুর! ওসব স্টেশনের খাওয়া। আয় চটপট বাথরুম থেকে হাত-পা ধুয়ে। তোয়ালে, সাবান সব রাখা আছে।"

পিকলু বাথরুমে ঢুকে দেখে— বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর বড়-সড় ঘর। কিন্তু কোনো ট্যাপের ব্যবস্থা নেই। বড় বড় প্লাসটিকের বালতিতে জল ভরা। হাত-পা সাবান দিয়ে ধুতে গিয়ে দেখল বেশ ঠান্ডা জল।

বাইরে থেকে বড়দি হাঁক দেয়— "পিকলু, বালতির জল কিন্তু ইঁদারার। বেশি ঘাঁটিস না, ঠান্ডা লেগে যাবে।"

পিকলু বের হয়ে বলে, "ইঁদারা কী বড়দি?"

শিউলি হাসতে হাসতে বলে, "জল তোলার কুয়োকে এখানে ইঁদারা বলে। ঐ দ্যাখ দূরে।"

পিকলু চেয়ে দেখে গোলাকৃতি বাঁধানো একটা চাতালের ওপর পুলি লাগানো, একজন শক্তসমর্থ লোক দড়িবাঁধা ছোট্ট একটা লোহার বালতি দিয়ে সেই পুলির মধ্যে দিয়ে টেনে টেনে জল তুলে একটা বড় বালতিতে রাখছে।

বেশি খিদে না থাকলেও সবার সঙ্গে পিকলুও বসে পড়ল একতলার লম্বা বারান্দায়। সব ভাইবোনেরা লাইন দিয়ে বসে পড়েছে। এমন কী পার্থদা

এ তো অবিকল সোমেন রে।

পর্যন্ত। ইমলি-ঝিমলি পিকলুকে বলেই দিল যে তাদের দিদি বলে ডাকার দরকার নেই, নাম ধরে বললেই হবে। ডাবলুও তাই।

গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম গরম লুচি, আলুর দম আর বাড়ির গরুর দুধে তৈরি জমাট ক্ষীর। বড় কাঁসার থালা আর বাটিতে পরিবেশন করল বড়দি। ক্ষীরকে সবাই চাঁচি বলে অভিহিত করছিল। ঠাকুমা বারান্দার এককোণে চেয়ারে হাসিমুখে বসে রইলেন। এর মধ্যে বাবার জ্যাঠ-তুতো ভাইপো-ভাইঝিরা এসে হাজির, তাদের বাড়িতে পিকলুকে নিয়ে যাবে বলে। এরাও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে রাতে ছোটরা সবাই ওই বাড়িতে খেতে যাবে পিকলুকে নিয়ে। মেজ জ্যাঠা শিক্ষক, উনি ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, শিউলিকে জিগ্যেস করলেন, "কীরে? তুই আজ যাবি না?"

"মেজকা, পিকলু এসেছে, আজ আমি যাব না, তুমি যাও।" পিকলু বুঝল বড়দিও স্কুল-টিচার।

এখানকার সবাই তাকে দেখে এতটাই আন্তরিক যে পিকলু অভিভূত হয়ে গেল। আরো অবাক হচ্ছিল বাবাকে দেখে, বাবা যেন তার ব্যক্তিত্বটা কলকাতায় ফেলে এসেছে। ঠাকুমা, জ্যাঠাইমা এমন কী বাড়ির চাষি, জেলে, গ্রামের অন্য মানুষদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে, যে তাকে রীতিমতো অপরিচিত লাগছে। ওরাও যেন নিজেদের একজনকে পেয়ে কত খুশি।

একটু পরে ফেলুদা এসে বলে, "চল পিকলু, তোকে আমাদের গ্রামটা দেখিয়ে আনি। বাইকের পেছনে বসতে পারবি তো?"

ইমলি-ঝিমলি হৈ হৈ করে ওঠে, "আমাদের সঙ্গে ও খেলছে, তুমি নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"আরে ও দু'দিন থাকবে। তখন খেলিস। চল পিকলু।"

পিকলুও বাধ্য ছেলের মতো মোটরবাইকের পেছনের সিটে বসে পড়ে। মিনিট পাঁচেক চলার মধ্যে দেখে নেয় চারপাশের আম, কাঁঠাল, তালগাছের সমারোহের মাঝে সোনাঝুরি আর অন্যান্য নাম-না-জানা গাছের সৌন্দর্য। রাস্তার পাশের একটা পুকুর ঢাকুরিয়া লেকের চেয়ে সামান্যই ছোট মনে হল। পঞ্চায়েত অফিস ছাড়িয়ে আসতেই পড়ল একটা বিশাল সবুজ মাঠ। পাশেই আর একটা পুকুর, অন্যদিকে তিনতলা স্কুলবাড়ি।— "পিকলু, আমাদের গ্রামের একমাত্র হাই স্কুল, আমাদের বাড়ির সবাই এই স্কুল থেকেই পাশ করেছি, এখনকার হেডস্যার আমার খুব পরিচিত, চল, আলাপ করিয়ে দিই।"

পিকলু দ্যাখে বাবার বয়সী এক-জন প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক নিজের ঘরে বসে রয়েছেন। এগারো-বারো ক্লাস ছাড়া অন্য ক্লাস হচ্ছে না। তাই স্কুল খালি খালি। ওর ধারণা ছিল, গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার মানেই ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতে বেতওয়ালা মোটা গোঁফের কোনো এক রাশভারী কেউ হবেন, বাজখাঁই গলায় মাঝে মাঝে হাঁক পাড়বেন—এই সব। কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে একটু হতাশ হল সে।

ফেলুদা আলাপ করিয়ে দিতে বললেন, 'সোমেনের ছেলে? তুমি তো কলকাতার নামী স্কুলে অল সেকশনে ফার্স্ট হও, তাই না।"

পিকলু বিস্মিত একই সঙ্গে লজ্জিত, ভাবে—তার সম্বন্ধে উনিও জানেন!

"আমাদের এই স্কুল থেকে গতবারের আগেরবার মাধ্যমিকে প্রথম কুড়ির মধ্যে একজন ছিল। সামগ্রিকভাবে রেজাল্ট ভালোই হয়, তবে তোমার বাবার রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি।"

"তার মানে?" পিকলুর ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। উনি লক্ষ না করে বলে চলেন জানালার দিকে চেয়ে—'সোমেন আর আমি এক ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। আমি পড়া-শোনায় খারাপ ছিলাম না, কিন্তু কোনোদিন ওকে হারাতে পারিনি। সব সময় ও ফার্স্ট হত, আর আমি ভাবতাম যে ওর বাবা এই স্কুলের হেডমাস্টার বলে সবাই ওকে বেশি মার্কস দিচ্ছে, কিন্তু মাধ্যমিকে যখন ও ফিফথ স্ট্যান্ড করল তখন বুঝলাম আমরা ওর কত পেছনে। দ্যাখো, তোমার বাবার কীর্তিকে তুমি ছাপিয়ে যেতে পারো কিনা।"

"বাবা মাধ্যমিকে ফিফথ হয়েছিল?" পিকলু চমকে ওঠে।

'সে কী তুমি জানতে না?" হেড-স্যার হাসতে হাসতে বলেন, 'সোমেনটা চিরদিন একই রকম রয়ে গেল, নিজের সম্বন্ধে ভালো কিছু বলতে এত অনীহা আমি দেখিনি কাউকে। যাও, স্কুলবাড়িটা ঘুরে দ্যাখো, ঐ পুকুর, মাঠ, সব কিছুই কিন্তু স্কুলের সম্পত্তি। তোমাদের স্কুলের মতো অত অল্প জায়গায় আমরা আবার পড়াতে পারি না।" বলে হাসতে থাকেন উনি।

ফেলুদার সঙ্গে স্কুল বিল্ডিংটা ঘুরতে গিয়ে দ্যাখে নতুন বাড়ির দেওয়ালের ফলকে অনেকগুলো নাম লেখা রয়েছে, যাঁরা সেটা নির্মাণ করতে অর্থসাহায্য করেছেন। চোখ ফেটে তার অজান্তে জল বেরিয়ে এল যখন তার নজরে এল তারই বাবার নাম সবার ওপরে জ্বলজ্বল করছে। পাশে দানের অঙ্ক এক লক্ষ টাকা। জলভরা চোখে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। চশমা ঢাকা চোখ বলে ফেলুদা কিছু বুঝতে পারল না, বলে, "চল, এবার মাঠটা দেখিয়ে আনি।"

"মাঠ আর কী ঘুরব ফেলুদা?"— পিকলু জানায়।

"ওরে, প্রতি বছর এই মাঠে বিশাল ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। বীরভূম তো বটেই, আসানসোল, বর্ধমান, দুর্গাপুর থেকেও টিম আসে খেলতে। ফাইনালে পুরস্কার বিতরণ কে করে বল তো?" ফেলুদা বলে।

'কে?" পিকলুর ভুরু কুঁচকোনো।

'তোর বাবা। ওর উৎসাহেই তো টুর্নামেন্ট চলে। ছোটকা গ্রামে না থাকলে কী হবে, এখানকার সব কিছুতে ও জড়িয়ে আছে, চল আমাদের ক্লাবে যাই।" মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেয় ফেলুদা।

ক্লাবে কয়েকজন ক্যারাম খেলছিল, ফেলুকে দেখে এগিয়ে আসে, পিকলুর পরিচয় জেনে ওরা কী খুশি। একজন বলে, "ক্লাবের পাশে যে বাঁধানো স্টেজ দেখছ, তোমার বাবা ওটা তৈরি করার টাকা দিয়েছেন। প্রতি দুর্গা-পুজো আর লবানে ওখানে যাত্রা করি আমরা।"

"'লবান' কী উৎসব?" পিকলুর প্রশ্ন।

ফেলুদা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "লবান কথাটা হল নবান্নের অপভ্রংশ। নতুন ধান ওঠার সময় এখানকার গ্রামগুলোতে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তোর বাবা তো প্রতিবছর আসে। তুই একবার আসতে পারলি না, দেখতিস কত মজা।"

"বাবা নবান্ন অনুষ্ঠানে আসে?" পিকলুর ঘোর কাটে না।

"হ্যাঁ, প্রতিবারই। সবাই মিলে অভিনয় দেখি, ক্লাবে পাত পেড়ে একসাথে খাই। কী আনন্দই না হয়!"

"চল ফেলুদা, বাড়ি যাই।" পিকলুর অন্যমনস্ক গলা।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চল যাই।" ফেলু একটু অপ্রস্তুত।

—

ছবি ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

বিচ্ছুর জাদুশক্তি

জুরান নাথ

গর-র-র!
আরক্কস!
বিচ্ছুর জাদু…
?!!
গর-র-র-ফ!
আঁ-আঁ-ক!
ভূত – ভূত –!! বাঁচাও!
ব্যাটারা আর গাছের ধারে-কাছে ঘেঁষবে বলে মনে হচ্ছে না!
এবং –
এবারের মত ওর ঘর বেঁচে গেল মনে হচ্ছে! কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে জানি না!

ইস্টবেঙ্গল ৩৬ বার লীগ জয় করল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ফুটবল লীগে ইস্টবেঙ্গল আবার চ্যাম্পিয়ন হল। এবার নিয়ে ৩৬ বার। এবারের মতো এত ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গল কখনও লীগ জেতেনি। এর মধ্যে ১৯৭০ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত টানা লীগ জিতে ইস্টবেঙ্গল যে রেকর্ড গড়েছিল আজও তা অম্লান। ১৯৭৫ আর ১৯৭৭ সালে তারা লীগের সব কটি ম্যাচ জিতেছিল।

সব থেকে মজার ব্যাপার হল মোহনবাগানের জুনিয়ার কোচিং দলেরই প্রহ্লাদ রায় প্রথম গোলদাতা। মোহনবাগান অ্যাকাদেমি থেকে উত্থান হলেও ২০১০-১১ সালে তিনি সবুজ-মেরুনে সই করতে না পারায় লাল-হলুদে সই করেন। থাকেন গ্রামে। রাত ৩টের সময় ঘুম থেকে উঠে প্র্যাকটিসে আসতেন প্রহ্লাদ। সেই কষ্ট করার মূল্য এতদিনে পেলেন। মোহনবাগান অ্যাকাদেমির ছেলেই শেষ করে দিলেন মোহনবাগানের লীগ জয়ের স্বপ্ন।

সে যাই হোক টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাদের লীগ জয়ের স্বপ্ন সফল করল। প্রথম খেলায় মহামেডানের কাছে হারার পরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোচ কোলাসো বলেছেন, আমার দায়িত্ব শেষ হল। আমি তরুণ খেলোয়াড়দের বেশি সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। দিয়েও ছিলাম। আমার সিদ্ধান্ত যে সঠিক তার প্রমাণ আমি দিয়েছি। প্রহ্লাদ আমর মুখ রেখেছে। তরুণ খেলোয়াড়রা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল অবশ্যই তাদের খেলা দিয়ে যে সিনিয়ারদের দলে জায়গা পেতে লড়তে হয়েছে। এটা যে কোনো দলের কাছে অত্যন্ত সুলক্ষণ। চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় বাজিমাত করল সেই একটি তরুণ ছেলে প্রহ্লাদ। ব্যান্টি দ্বিতীয় গোলটি করেছে।

টালিগঞ্জের পক্ষে একটি গোল শোধ করেছেন বেলো। সে যাই হোক ৩৬ বার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। এবার আবার টানা পাঁচবার। এখন একমাস ছুটি কাটাবে ইস্টবেঙ্গল। তারপর ফেড কাপে ব্যান্টি, ডুডু, প্রহ্লাদদের

ফের দেখা যাবে। অক্টোবরের মাঝামাঝি শুরু হবে সেই প্রতিযোগিতা। ব্যান্টিকে পাঁচজন খেলোয়াড় এমন ভাবে সুব্রতর পাতা টালিগঞ্জের ফাঁদে ফেলেছিলেন যে তিনি আর ডুডু যা করার কথা তা করতে পারছিলেন না। প্রহ্লাদ সেই কাজটি করে দেওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন সফল হয়ে যায়। কোলাসো বলেছেন, আমি তরুণদের ওপর একটু বেশি আস্থা রেখেছিলাম বলে অনেকে আমার যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন। এবার তাঁরা কী বলবেন! সেদিক দিয়ে আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে প্রহ্লাদ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ব্যান্টি বলেছেন ঈশ্বর চাইলে ফেড কাপ, আই লীগের ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের তাঁবুতেই শোভা পাবে।

এশীয় ক্রীড়ায় প্রথম সোনা জিতু রানার

ইনচিয়নে এশীয় ক্রীড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। জিতু রানা ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছেন। জিতু ফৌজি বিভাগের সুবেদার। বাড়ি নেপালের একটি গ্রামে। সাইনা নেওহাল ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। রোজই কেউ না কেউ পদক পাচ্ছেন।

যাঁরা পদকের জন্যে লড়ছেন তাঁদের তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

শুটিং

গগন নারাং

দু'মাস আগে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে একটি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ভালো ফর্মে আছেন।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

জিতু রাই

গ্লাসগো গেমসে রুপো। সদ্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও রুপো জিতেছেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

বক্সিং

মেরি কম

গতবারের ব্রোঞ্জজয়ী। গ্লাসগোয় যোগ্যতা পাননি। সারা দেশে তাঁর ফিল্ম নিয়ে আগ্রহের মধ্যে পরীক্ষা।

সম্ভাব্য পদক ঃ ব্রোঞ্জ

মনদীপ জাংড়া

৬৯ কেজি বিভাগে গ্লাসগো কমনওয়েলথে রুপো জয়ী। লড়াই প্রাক্তন সোভিয়েত অন্তর্গত দেশের বক্সারদের সঙ্গে।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

ব্যাডমিন্টন

পি ভি সিন্ধু

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দু'বার ব্রোঞ্জ। চিনের বিরুদ্ধে সাইনা নন, তিনিই ভারতীয়দের সেরা বাজি।

সম্ভাব্য পদক ঃ ব্রোঞ্জ

পারুপল্লি কাশ্যপ

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

স্কোয়াশ

সৌরভ ঘোষাল

বিশ্বের ১৬ নম্বর, শেষ আটে পৌঁছেছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে। ইনচিয়নে শীর্ষ বাছাই।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

দীপিকা পাল্লিকল ও জ্যোৎস্না চিনাপ্পা

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ডাবলসে সোনা জয়ী।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

কুস্তি

যোগেশ্বর দত্ত

লন্ডন অলিম্পিক্সে রুপো ও গ্লাসগো কমনওয়েলথে সোনা জয়ী। ২০০৬-এর এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

অমিত কুমার

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইলে সোনা জয়ী।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

অ্যাথলেটিক্স

বিকাশ গৌড়া

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ডিসকাসে সোনা জয়ী।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

মেয়েদের ৪x১০০ মিটার রিলে দল

গত বছর এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিল।

সম্ভাব্য পদক ঃ ব্রোঞ্জ

সীমা পুনিয়া

ডিসকাসে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জয়ী।

সম্ভাব্য পদক ঃ ব্রোঞ্জ

প্রীজা শ্রীধরন

গত এশিয়ান গেমসে ১০ হাজার

মিটারে সোনা জয়ী। এবার ৫ হাজার মিটারেও নামছেন।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

রোয়িং

বজরং লাল ঠক্কর

পুরুষ সিঙ্গলসে গতবার সোনা জিতেছিলেন। দোহায় জিতেছিলেন রুপো। এবারও দলে আছেন তিনি।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

পুরুষদের হকি দল

এখানে সোনা জিতলে সরাসরি রিও অলিম্পিকে খেলার সুযোগ। পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া-র সঙ্গে লড়াই।

সম্ভাব্য পদক ঃ রুপো

কবাডি

পুরুষরা গত ছ'বারের সোনা জয়ী। মেয়েরাও গতবার সোনা জিতেছিল।

সম্ভাব্য পদক ঃ সোনা

আজাহারউদ্দিনকে টপকে গেলেন ধোনি

ইংলন্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে হারার পর যেই ধোনির দল একদিনের ক্রিকেটে সিরিজ জিতল অমনি সারা ভারত জুড়ে ধোনি-বন্দনা শুরু হয়ে গেল। বার্মিংহ্যামের শেষ একদিনের ম্যাচটি ধাওয়ান আর রাহানে আপরাজিত ৯৭ রান যোগ করতেই জয় এসে গেল ধোনির মুঠোয়। রাহানে করলেন ১৬৮ আর শিখর ধাওয়ান অপরাজিত ৯৭ রান। কোহলি ১ রান করলেন রাহানে আউট হয়ে যাওয়ার পর শিখরকে সঙ্গ দিতে এসে। মজার কথা, খেলার তখনই প্রায় ২০ ওভার বাকি।

ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে, টেস্ট সিরিজে শিখর ধাওয়ান আর রাহানে খেলতে না পারার জন্যে বাদ পড়েছিলেন। টেস্ট সিরিজে যাঁরা বুক চিতিয়ে খেলতে পারেননি, একদিনের ম্যাচে সেই খেলোয়াড়রা কোন জাদুবলে কুকের দলকে ল্যাজে-গোবরে করে দিলেন? কারণ, আর কিছুই নয় রবি শাস্ত্রীর টিপস বা ক্রিকেট বুদ্ধি।

শেষ টেস্ট জেতার সঙ্গে সঙ্গে ধোনি একদিনের ক্রিকেটে আজাহার-উদ্দিনের জেতার রেকর্ড অতিক্রম করে গেলেন।

নীচে ভারতের ৫ ক্যাপ্টেনের একদিনের ক্রিকেট জেতার খতিয়ানঃ

	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	টাই	নো রেজাল্ট	জেতার %
এম ধোনি	১৬২	৯১	৫৭	৪	৪	৫৬.১৭
আজাহারউদ্দিন	১৭৪	৯০	৭৬	২	৬	৫১.৭২
সৌরভ গাঙ্গুলি	১৪৬	৭৬	৬৫	০	৫	৫২.০৫
রাহুল দ্রাবিড়	৭৯	৪২	৩৩	০	৪	৫৩.১৬
কপিলদেব	৭৪	৩৯	৩৩	০	২	৫২.৭০

এই খতিয়ান পরিষ্কার দেবে ভারতের ৫ জন ক্যাপ্টেনের জেতার পারফরমেন্স। তবে একদিনের ক্রিকেটে এবারের মরশুমে আবার প্রমাণ হয়ে গেল একদিনের ক্রিকেটে ধোনি যতটা সফল, টেস্ট ক্রিকেটে কিন্তু তিনি ততটাই ব্যর্থ। লর্ডসের প্রথম টেস্টে ধোনি জিতে যে আশা জাগিয়েছিলেন, পরের টেস্টগুলোতে তার ওপর জল ঢেলে দিয়েছেন ধোনি। তখন মাঠে কর্তৃত্ব করেছেন ইংলন্ডের কুক। আর আমরা হতাশায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি যার ওপর বড় আশা ছিল সেই কোহলির

ছোটদের উপহার দিন

আমাদের বই পাওয়া যায়

- *সাহিত্য বিচিত্রা—কোচবিহার*
- *মডেল বুক ডিপো—মালদা*
- *নিউ গ্রন্থ বিচিত্রা—রায়গঞ্জ*
- *লালাজী পুস্তকালয়—কালনা*
- *পাইওনিয়ার—রানাঘাট*
- *সাহিত্য ভারতী—ঝাড়গ্রাম*
- *মল্লিক পুস্তকালয়—মেদিনীপুর*
- *মহাজাতি গ্রন্থভবন— কৃষ্ণনগর*
- *বুক কর্ণার—বহরমপুর*

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

৯৩এ লেনিন সরণি (মৌলালি)
কলকাতা ৭০০ ০১৩
ফোন : ২২২৭ ২৩৩৬, ২২৬৫ ৬৯২৪

কিশোরদের অসাধারণ গ্রন্থসম্ভার

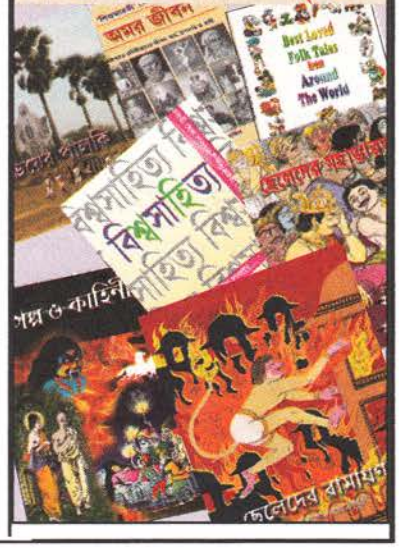

জন্য। গোটা সিরিজে তাঁর পারফরমেন্স ভুলে যাবার মতো। অথচ ওঁকেই টেস্ট ক্রিকেটে ক্যাপ্টেন করার জন্যে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা অনেক কাগজ-কলম ব্যবহার করেছেন। ধোনির ব্যক্তিগত পারফরমেন্স অবশ্য অনেকের চেয়ে ভালো ছিল। তবু হয়তো আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেট-এর কথা মাথায় রেখে টেস্ট ক্যাপ্টেন অন্য কাউকে করা হবে।

এক নজরে

নেতৃত্বে মনোজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতীয় এ দলের দলনেতা মনোনীত হয়েছিলেন মনোজ তিওয়ারি। এর আগে অবশ্য তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় এ দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের মাটিতে তিনি এবারের আগে ভারতীয় এ দলের নেতৃত্ব দেননি। গত ৩ ও ৫ অক্টোবর মুম্বাইয়ে খেলা দুটি হবে। মনোজ বলেছিলেন, দেশের মাঠে ভারতীয় এ দলের নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি খুব খুশি। এই ম্যাচ দুটিতে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে খেলব। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, মনোজের খবরটা শুনে আমি খুব খুশি। ভারতীয় দলে এখন একটু ভাঙাগড়া চলছে। সব সময়ই চলে। ভালো খেলে নির্বাচকদের নজর কাড়ার একটা বড় সুযোগ।

একটুর জন্যে

পেনাল্টি নষ্ট করে লিওনেল মেসি ৪০০ গোল করার ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে পারলেন না। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। সেই ম্যাচে লেভান্তেকে মেসির দল বার্সিলোনা ৫-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। বার্সিলোনার পক্ষে গোলগুলি করেছেন নেইমার, বাকিতিচ সান্ডো, পেদ্রো

ও মেসি। এই ম্যাচটিতে নেইমার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন। বার্সার কোচ বলেছেন, ওর গোড়ালিটা ফুলে আছে। সম্ভবত পরের ম্যাচ মালাবারের বিরুদ্ধে খেলতে পারবে না।

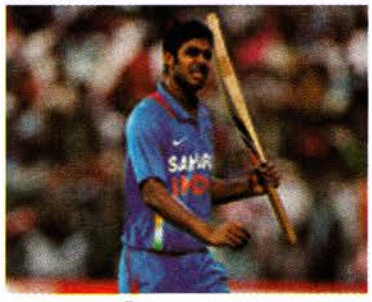

ডাক্তারি পড়া ছেড়ে

টানা ১৮ মাস ধরে ডাক্তারি পড়েছেন। ফুটবল জগত ভেবে-ছিল একজন ফুটবলার ডাক্তার এতদিনে পাওয়া গেল। নাম ফ্যাজিও। ফুটবল আগেই খেলতেন। টটেনহ্যামের খেলোয়াড়। ভালোই খেলেন। জানতেন, ডাক্তারি পড়তে গেলে ফুটবল খেলার ক্ষতি হবে, পড়ারও হবে। তবু ১৮ মাস চেষ্টা করেছেন। এখন বুঝেছেন দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না। বেছে নিতে হবে একটাকে। ভেবেছেন দীর্ঘদিন। কূলকিনারা পাননি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, ফুটবল তাঁর প্রথম প্রেম। চুলোয় যাক ডাক্তারি। ফ্যাজিও তাই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে পাকাপাকিভাবে ফিরে এলেন ফুটবল মাঠে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন টোটেনহ্যামের কর্তারা। ঘরের ছেলের মাথা থেকে ডাক্তার হবার ভূত নেমেছে।

এবার টেনিসে

আই. পি. টি. এল—ইন্টারন্যাশনাল প্রিমিয়ার টেনিস লীগ—ব্যাপারটা আমাদের স্বল্প পাল্লার ক্রিকেটের মতো। কোটি কোটি টাকার খেলা। ফেডেরার, জোকোভিচ, পিট সামপ্রাস, আন্দ্রে আগাসি, সেরেনা উইলিয়ামস-এর মতো খেলোয়াড়রা চোখের সামনে খেলবেন। নাদালেরও আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারছেন না। ডিসেম্বর মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে। অ্যান্ডি মারেও খেলবেন দিল্লির ঐ কনকনে ঠান্ডায়। খেলোয়াড়রা ঐ শীতে খেলতে অভ্যস্ত। চারটে ফ্রানচাইস দলে খেলবেন। খেলোয়াড়দের দর উঠেছে কোটি কোটি টাকা। নামকরা অধিকাংশ খেলোয়াড়। ফেডেরার খেলবেন ইন্ডিয়ান একস দলে আবার সেরেনা উইলিয়ামসকে দেখা যাবে সিঙ্গাপুর স্লামারস দলে। সব মিলিয়ে টেনিসের উৎসব বসবে তিনদিন ধরে। আই. পি. এল. পথ দেখিয়েছে। শুরু হয়ে গেল টেনিস, প্রস্তুত ফুটবলও।

উক্তি

আই. এস. এল. সফল হবে যদি ঠিকঠাকভাবে ম্যানেজ করা যায়। তাতে ভারতীয় ফুটবলের যথেষ্ট মঙ্গলও হবে। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেললে খেলার উন্নতি হবেই।

সৌরভ গাঙ্গুলি

(আই. এস. এল. সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

আমি ভারতের পক্ষে ওলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণপদকটি পেয়েছি। এর থেকে বেশি পাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি না। অনেক পদক আমি পেয়েছি। যথেষ্ট সম্মানও। জায়গা ছেড়ে দেবার এইটাই সেরা সময়।

অভিনব বিন্দ্রা

(অবসর নেবার ২৪ ঘণ্টা আগে)

লর্ডসে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ধোনি ভেবেছিলেন তিনি বোধহয় দেশের মাঠে খেলছেন। তারপর যে কে সেই ভারতের বস্তাপচা পারফরমেন্স এবং বাকিগুলোতে মেরুদণ্ড ভাঙা খেলা।

বি. এস. বেদী

(ইংলন্ডে ভারতের পারফরমেন্স প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে)

পারফরমেন্সই প্রমাণ করবে কোহলির মন খেলার দিকে ছিল কিনা। বিরাট সত্যিই বড় খেলোয়াড়। কিন্তু একজন খেলোয়াড়ের বিচার শুধু মাঠের পারফরমেন্স দিয়ে করা হয় না। মাঠের বাইরেটারও বিচার করা হয়। ভারতীয় ক্রিকেটে অভিনব ঘটনা এবার দেখলাম।

সেলিম দুরানী

(একটি অনুষ্ঠানে এবারের সফর নিয়ে বলতে গিয়ে)

পরবর্তী বিশ্বকাপে ধোনিকেই ভারতের দলনেতা করা হোক। ওর নেতৃত্বে একদিনের ক্রিকেটে ভারত চ্যাম্পিয়নের মতো খেলে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যেভাবে ভারত খেলেছে তা সত্যিই মনে রাখার মতো।

সুনীল গাভাসকার

(একটি অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে)

কেউ ভোলে, কেউ ভোলে না

সমীর গোস্বামী

খেলোয়াড়দের জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রায় সময়েই নানা মজার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন দেশে আবার নানারকম উদ্ভট ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

তুরস্কের নায়িম সুলেম্যানোগ্লু এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে অনেক সময় হৈচৈ পড়ে যেত। কী রকম?

তিনি কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে বসলে সকলে অবাক চোখে দেখতেন। কোনো রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারই কখনও তাঁর কাছে পয়সা চাইতেন না। ওঁরা বলতেন, নায়িম আসায় আমার রেস্টুরেন্টের প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে দর।

নায়িম গাড়ি চালাতেন দ্রুত গতিতে। এরফলে পুলিশ তাঁকে ধরতেন। কিন্তু যখনই পুলিশ দেখতেন যে চালক দেশের 'প্রিয়' মানুষ, তাঁরা জরিমানা করতেন না। বরং বলতেন, 'আপনার যাত্রা শুভ হোক।'

নায়িম ছিলেন একজন ভারোত্তোলক। এরপর তিনি সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন। ভারোত্তোলনের বিশ্ব ইতিহাসে তিনি একমাত্র ক্রীড়াবিদ যিনি তিনটি ওলিম্পিক্সে সোনার পদক জেতার পরই তুরস্কে সকলের গর্বের মানুষ হয়ে উঠে-ছিলেন। '৯৬ সালের আটলান্টা ওলিম্পিক্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই নায়িম হয়ে ওঠেন দেশের আদরের মানুষ।

* *

খেলার মাঠে নানা সংস্কার দেখা যায়। এমনকী চিনারাও এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কী রকম?

চিনদেশে আট সংখ্যাটি খুবই 'পয়া'। সেই কারণেই ২০০৮ সালের ওলিম্পিক্সের পরিচালনার দায়িত্ব চেয়েছিলেন ওঁরা।

ওঁরা ২০০৮ সালে ওলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন করেছিলেন ৮ আগস্ট। অর্থাৎ আট সালের অষ্টম মাসের আট তারিখ। চমৎকার হিসাব—৮/৮/০৮।

উদ্বোধন হয়েছিল শুক্রবার এবং ঠিক রাত ৮টা ০৮ মিনিটে।

উজ্জ্বল বেঞ্চ

বীরু বসু

প্রধান শিক্ষিকা ছবি ঢাল। তাঁর প্রশংসা করতেই হয়। যে দিন থেকে তিনি মগরা বাগাটী শিবচন্দ্র ব্যানার্জি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সেদিন থেকেই রাজ্য মহিলা ভলিবলে হুগলি জেলার এই স্কুলটি থেকে প্রচুর খেলোয়াড় আসছে। শুধু লেখাপড়া নয়, পাশাপাশি খেলাধুলো শেখাটাও একান্ত প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষিকা এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী। সে কারণেই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই রাজ্য মহিলা ভলিবলের প্রথম সারিতে উঠে এসেছে এই স্কুলেরই দুই ছাত্রীর নাম। ওরা দু'জনেই দশম শ্রেণির ছাত্রী। মগরা ভলিবল অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী—রক্তিমা সাহা এবং অর্পিতা চক্রবর্তী। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন থেকেই অঙ্ক কষা শুরু করে দিয়েছেন রাজ্য ভলিবলের কর্মকর্তারা।

বয়স কম হলেও প্রতিভার জোরে এরা এখন প্রচারের আলোয় উঠে এসেছে। স্কুলের পাশেই মগরা ভলিবল অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণ চলছে। কোচ অভিজিৎ দত্ত এবং প্রভাত ঘোষের তালিম পেয়েই রক্তিমা এবং অর্পিতা প্রকৃত ভলিবলার হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ত্রিবেণী বৈকুণ্ঠপুরের সাহাপাড়া এবং মগরা আমোদঘাটা অঞ্চলে পৌঁছে ওদের কথা জানতে চাইলেই প্রতিবেশীরা বাড়ি দেখিয়ে দেবে। রক্তিমার মা জেমিতা সাহা এবং অর্পিতার মা রত্না চক্রবর্তী ভলিবল অন্ত প্রাণ। বিকেল হলেই অ্যাকাডেমির মাঠে চলে আসেন। গত চার বছরে একনাগাড়ে খেলে যাচ্ছে এই দুটি মেয়ে। মিনি, সাবজুনিয়র খেলার পরেও ক্লাব ভলিবলেও দুজন একসঙ্গে মাঠে নেমেছে। জাতীয় মিনি এবং সাবজুনিয়রে ভালো খেলার ফলেই কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামী এই দুই ভলিবলারকে প্রথম ডিভিশন দলে খেলার জন্য সই করিয়েছিল। বয়সে ছোট হলেও পাল্লা দিতে বড়দের সঙ্গে দারুণ খেলেছিল রক্তিমা এবং অর্পিতা। কোনো ম্যাচ না হেরেই রাজ্য ভলিবল লিগে প্রথম ডিভিশন থেকে সুপার ডিভিশনে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাব। সাফল্যের তকমা লাগিয়েই রক্তিমা এবং অর্পিতা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং কোচ অভিজিৎ দত্তর মন জয় করেছে। ভলিবল কোর্টে প্লেসিং নেওয়ার ব্যাপারে ওদের জুড়ি পাওয়া ভার। দুজনের ক্ষেত্রেই লিফটিং, ব্লকিং এবং ডিফেন্স অত্যন্ত

রক্তিমা সাহা

অর্পিতা চক্রবর্তী

ভালো। অফুরন্ত স্ট্যামিনা এবং শারীরিক বল না থাকলে ভলিবল খেলা মুশকিল। এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সিরিয়াস এই দুটি মেয়ে।

খেলা ছাড়া হাসি-আড্ডায় মশগুল থাকে রক্তিমা এবং অর্পিতা। বয়সের আন্দাজে দুজনেই বেশ লম্বা। যেটা ভলি খেলার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। তবে এখনই সব কিছু নয়। সামনে অনেক দূর যেতে হবে। যেভাবে আগের মেয়েরা কষ্ট করে সুনামের শীর্ষে স্থান পেয়েছে ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে আসতে হবে রক্তিমা এবং অর্পিতাকে। মনে রাখতে হবে স্কুলকে। কারণ ওরা যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলের মেয়েরাই কিন্তু বহুবার রাজ্যের বর্ষসেরা ভলিবলার নির্বাচিত হয়েছে। এ সমস্ত কথা মাথায় রেখেই ওদের এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে স্কুল এবং মগরা ভলিবল অ্যাকাডেমি পাশে না থাকলে এত দূর উঠে আসা মুশকিল ছিল।

মেয়েদের গড়তে মায়েদের চেষ্টার শেষ নেই। অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন রক্তিমার মা জেমিতা এবং অর্পিতার মা রত্নাদেবী। অর্পিতার মা ছোটখাটো কাজে ব্যস্ত থাকলেও রক্তিমার মা কিন্তু অনেক কষ্টে দিন-যাপন করছেন।

চাকরির সুবাদে রক্তিমার বাবা দুর্গাপুরে থাকেন। মাসে চারদিন হয়তো বাড়িতে থাকেন। ফলে পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম একা হাতেই সামাল দিচ্ছেন জেমিতা দেবী। ত্রিবেণীর বাড়িতে বসেই জানালেন ভলিবল খেলে একমাত্র মেয়ে রক্তিমা বড় হলে সব কষ্ট ঘুচে যাবে। আপনাদের পত্রিকা (শুকতারা) যেভাবে সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিভা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাতে রক্তিমার মা হিসাবে আমি কৃতজ্ঞ। গর্ব করে বলতে পারি এই অ্যাকাডেমিরই খেলোয়াড় দেবীষা বর্ধন যার কথা গত কয়েক মাস আগে শুকতারার পাতায় ছাপা হয়েছিল। সেই দেবীষা এখন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়। প্রতিভা অন্বেষণের অন্যতম মাধ্যম যে 'শুকতারা' এটা স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই।

কুইজ কুইজ-এর উত্তর :

(১) কম্বোডিয়ার আংকর ভাট মন্দির। বিষ্ণু মন্দির।
(২) শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির। তামিলনাড়ুতে।
(৩) ইংলন্ডের ওয়েস্টারশায়ারের স্টেনহেজ মন্দির আর মিশরের লাক্সর মন্দির।
(৪) বিহারের মুণ্ডেশ্বরী দেবী মন্দির।
(৫) ক্রোয়েশিয়া।
(৬) মার্গারেট থ্যাচার।
(৭) বুধবার।
(৮) জর্জ—রাজকুমার জর্জ।
(৯) মোরিয়ান ম্যাকোদ্যা। ভার্জিনিয়া।
(১০) ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে।
(১১) ১৫০০ কে জি সোনা।
(১২) তামিলনাড়ুতে।

সুস্থ থাকতে হলে

তুষার শীল

সুপ্ত বজ্রাসন

সময়ানুবর্তিতা অর্থাৎ ঠিক সময়ে কাজ করা বা ঠিক সময় হাজিরা দেওয়া। কিছুদিন আগে আমি ও তোমাদের অভীককাকু অর্থাৎ কবি অভীক বসু যিনি কবি সুনির্মল বসুর পুত্র একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তখনও অনুষ্ঠানের আয়োজকরা অনেকেই এসে পৌঁছয়নি। এমনকি দর্শক এবং শ্রোতার হাজিরাও কম। বেশ কিছুক্ষণ পরে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় যা বাঙালির মজ্জাগত। অভীকদা মঞ্চে উঠেই প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করলেন—

"এসে ছিলাম বসে ছিলাম
দেখলাম কেউ নেই,
আমার সাড়ে পাঁচটা হল
পাঁচটা তিরিশেই।"

হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা, আমি মনে মনে ভাবছি এ কোন বাঙালি সমাজ! বাহবা দিই অথচ পালন করি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, তবুও ঠিক পথে এখনও আনতে পারেননি। আমরা তো কোন ছাড়। তাই তোমাদের বলি "আপনি আচারি ধর্ম"। তোমরাই পারবে এই পরিবর্তনের যুগে সমাজকে পরিবর্তন করতে। ঘুষ খাওয়া, ঘুণ ধরা, একে অপরকে অবিশ্বাস করা, ঘৃণা করা, মিথ্যা কথা বলা—এসব থেকে সমাজকে মুক্ত করা শুধু স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করলেই হবে না। শিখতে হবে সত্যকে অবলম্বন করা।

এখন আজকের আসন **সুপ্ত বজ্রাসন**। এই আসন করতে হলে বজ্রাসনে বসো অর্থাৎ হাঁটু ভাঁজ করে দু'পায়ের পাতা মাটিতে উল্টো করে পেতে দাও। পায়ের পাতার ওপর দিক মাটিতে লেগে থাকবে। পাতা দুটি জোড়া করে রাখবে। পায়ের পাতার উপর নিতম্ব ঠেকিয়ে বসো। দরকার হলে গোড়ালি দুটি অল্প ফাঁক করে নিতে পারো। দু'পায়ের পাতা পিছন দিকে মাটিতে পাতো ও শরীরটাকে পিছনে হেলিয়ে দাও। আস্তে আস্তে কনুই ভাঁজ করে, কনুই-এর উপর ভর দিয়ে চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ো। হাত দুটি মাথার কাছে এনে কনুই ভাঁজ করে এক হাত দিয়ে অন্য হাতের কনুই ধরো। এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে ২০—২৫ সেকেন্ড থাকতে চেষ্টা করো। না পারলে ১০—১৫ সেকেন্ড থাকতে পারো। আসন শেষ হলে এই অবস্থা থেকে উঠে বসার চেষ্টা না করে এক পাশ ফিরলেই দেখবে পা খুলে যাবে। চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও। ২/৩ ক্ষেপে অভ্যাস করো।

যারা ধাপে ধাপে করবে তাদের অনুশীলন পদ্ধতিটা হল এইরকম—বজ্রাসনে বসার পরে, শরীরটা অল্প পিছনে হেলিয়ে হাতের তালু দুটি মাটিতে পেতে রেখে এই অবস্থানে কিছুদিন অভ্যাস করো। এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে হাতের তালু দু'টি গোড়ালির কাছে এনে তালু থেকে কনুই অবধি মাটিতে লাগিয়ে রেখে শরীরটা আরও পিছনে হেলিয়ে দিয়ে অভ্যাস করো।

উপকারিতা ঃ স্লিপ ডিস্ক, স্পন্ডিলাইটিস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্ল, ক্ষুধামান্দ্য, হাঁটু ও পায়ের বাতের ব্যথা সারায়। যাদের পা কামড়ায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তারাও উপকার পাবে। বহুমূত্র ও হাঁপানি রোগ সারে। তবে হাঁটুতে যাদের অসটিও আর্থারাইটিস রয়েছে বা খুব ব্যথা তারা আসনটি এখন করতে যাবে না।

—

ছবি ঃ লেখক

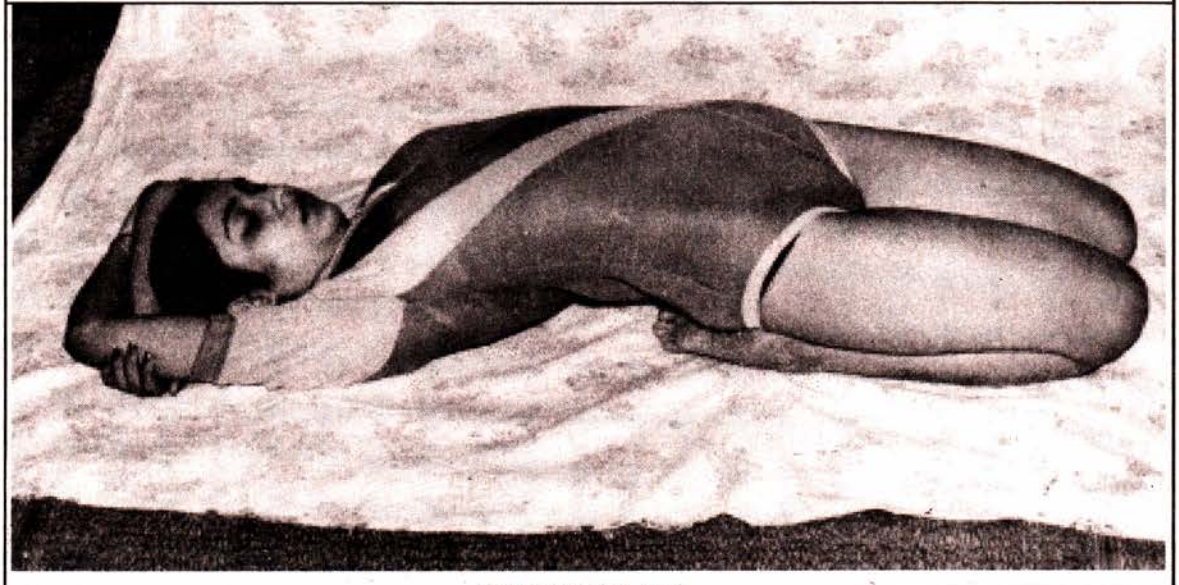

ভৌতিক সম্মেলনে অষ্টদা

পীযূষকান্তি সরকার

।।১।।

বুর্চির পোশাক পরে ছোটো মামদো ওরফে বাণেশ্বর অষ্টদার রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজ করে। তাকে কাজে বহাল করার পর থেকে অষ্টদার 'আপনজন' রেস্তোরাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে। কোনো কোনোদিন বাইরে লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মোগলাই'-এর আশায়। বাণেশ্বর যে আসলে ভূত তা অবশ্য তারা জানে না।

বাণেশ্বরের মতো কয়েকজন ভূত এখন ভয় দেখিয়ে বেড়ানোর বদলে মানুষের বাড়িতে, গ্যারেজে, পেট্রোল পাম্পে কাজ করে বেড়ায়। নিজেদের অস্তিত্বের সংকট কাটাতে তারা এখন মানুষের কাছে আসতে শুরু করেছে।

সেদিন রাতে হিসেবপত্র মিলিয়ে অষ্টদা ক্যাশবাক্স বন্ধ করে সেটায় তালা লাগানোর পর ছোটো মামদো ওরফে বাণেশ্বর বলে উঠল, আজ্ঞে অষ্টবাবু, একটা কথা বলার আছে।

অন্যমনস্কভাবে অষ্টদা বলল, কথা! কী কথা বলবেন বলুন!

আজ্ঞে, আগামী শুক্রবার আমায় ছুটি দিতে হবে।

ছুটি! সে কী! কোনো উৎসব আছে নাকি!

আজ্ঞে তা নয়, আগামী শুক্রবার অমাবস্যা, ওইদিন রাতে আমাদের বিশেষ মিটিং আছে।

আপনাদেরও মিটিং হয় নাকি!

হয় না আবার, বলেন কি! মিটিং-ইটিং সবই হয়। তবে এতদিন যা হয়েছে সে-সবই জেলাভিত্তিক মানে এই হাওড়ার মধ্যেই। কিন্তু এটা হল গিয়ে স্পেশাল মিটিং—তাই ছুটি চাইছি।

ছুটি না-হয় পাবেন। কালই নোটিশ টাঙিয়ে দেব শুক্রবার দোকান বন্ধ থাকবে বলে। কিন্তু স্পেশাল মিটিং বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। আমাদের হাওড়ার ভূতেরা কলকাতায় গিয়ে সেখানকার ভূতেদের সঙ্গে যৌথ সম্মেলনে যোগ দেবে। তার জন্য তো প্রস্তুতির দরকার। ভালো করে একটু ঘুমানো দরকার। আপনার এখানে ডিউটি করা মানেই তো আমার সারারাত জাগা হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর মিটিং পরিচালনা করা কি সম্ভব!

আপনি মিটিং পরিচালনা করবেন— মানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন! অষ্টদার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

হ্যাঁ অষ্টবাবু, সেটা তো আছেই। তার সঙ্গে মিটিং-এর সময় যে চা-জলখাবার দেওয়া হবে, তাও দেখার ভার আমার।

তা মিটিংটা হবে কোথায়?

কলকাতার নরেন্দ্রপুরে গেছেন কখনো?

হ্যাঁ গেছি তো, ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে।

সেই নরেন্দ্রপুরের ভিতরদিকে

এলাচি বলে একটা জায়গা আছে। ওখানে খালের ধার বরাবর প্রচুর গাছপালা ছিল। আমাদের কলকাতার ভূত-বন্ধুরা সেখানে থাকত। সব কেটে-ছেঁটে খালের দু'পাশ বরাবর বারুইপুর পর্যন্ত নতুন বাইপাস তৈরি হচ্ছে। আশপাশের জমি কিনে নিয়ে বিরাট বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। শুক্রবার অমাবস্যার রাতে বাইপাসের কাজ বন্ধ থাকবে। তাই ওখানে যে খাটালটা আছে তার পাশেই আমাদের যৌথ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

আপনাদের মিটিং দেখার একটা সুযোগ করে দিন না! অষ্টদার কণ্ঠে আবদারের সুর।

ওরে বাবা! সে কী করে সম্ভব! প্রায় লাফিয়ে ওঠে বাণেশ্বর, মানুষ হয়ে ভূতের মিটিংয়ে গেলে ওরা আপনাকে চিনতে পারবেই—তখন ঝামেলা কে সামলাবে!

সে কী কথা! তাহলে মিটিং দেখার কোনও উপায় নেই! অষ্টদার কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্টদার তীব্র ইচ্ছের কাছে বাণেশ্বর হার মানতে বাধ্য হয়। বলে ওঠে, উপায় যে নেই তা নয়, তবে সেটা সাবধানে পালন করতে হবে। ভুলচুক হলেই লোকান্তরিত হবার সম্ভাবনা।

তার মানে? আশঙ্কা বিজড়িত কণ্ঠে অষ্টদা প্রশ্ন করে।

আরে বুঝতে পারছেন না! ভূতেদের মাঝে বসে তাদের জলখাবার খাবেন, চা-পান করবেন। বুঝতে পারলে দলে টানতে চাইবে না—ভাবলেন কী করে!

দু'দিন বাদে বৃহস্পতিবার রাতে অষ্টদার হাতে একটা বড় সুতির চাদর আর একটা বিশেষ ধরনের কালো চশমা তুলে দিয়ে বাণেশ্বর বলল, শুনুন অষ্টবাবু, এই চাদরটায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে গেলে ভূতেরা আপনার গায়ের গন্ধ পাবে না, ভাববে আপনি তাদের সমগোত্রীয়। আর এই চশমাটা না পরলে কিন্তু কাউকেই দেখতে পাবেন না। তবে সাবধান, কোনোমতেই ভয় পাবেন না, তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

অষ্টদা হেসে বলল, না, না, ভয় পাব কেন? তাছাড়া আপনি তো কাছেপিঠেই থাকবেন।

বাণেশ্বর বলল, তা তো বটেই, তবে একটা সমস্যা কিন্তু আছে। অনেক রকমের ভূত আছে, যেমন কেউ 'মেছো ভূত' তার পাশে বসলে মাছের আঁশটে গন্ধে নাক জ্বালা করবে। কেউ 'টোকো ভূত'—তার পাশে বসলে বিচ্ছিরি 'টক-গন্ধ' ছাড়বে। সেসব গন্ধে যদি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে 'ওরে বাপরে' বলে ফেলেছেন কি গেছেন!

আচ্ছা আমি যদি দামি সেন্ট-মাখা রুমাল নাকে চেপে ধরে বসে থাকি? অষ্টদা সমাধান খোঁজে।

হ্যাঁ সেটা হতে পারে। আপনাকে ভাববে অফিসার ভূত—এরকম দু'চার-জন থাকবে। তবে সাবধান—কথা কইবেন না যেন—আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবেন।

অষ্টদা বলল, আমি তো দেখতে-শুনতে যাচ্ছি, বকবক করতে যাব কেন? কিন্তু যেটা জানা জরুরি সেটা হল মিটিং শুরু হবে ক'টায় আর চলবে কতক্ষণ?

দেখুন অষ্টবাবু এটা ভৌতিক সম্মেলন—আপনাদের মতো বারোটা বলে দুটো হবে না। আপনাদের বক্তারা তো মাইক-এ বলবার সুযোগ পেলে আর ছাড়তেই চায় না। আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বেশি কথা বলা ডিস্‌ক্রেডিট বলে বিবেচিত হয়। সম্মেলন শুরু হবে রাত বারোটায় আর শেষ হবে বারোটা পঁয়তাল্লিশে। একটার মধ্যে আপনার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবেন।

।।২।।

অষ্টদা মোবাইলে তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে নিল। এর আগে বন্ধুর বাড়ি থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন ঘুরে দেখে এসেছে। বন্ধু তার আবাসনের গেটে সিকিউরিটিকে বলে রাখবে। রাত একটা বাজলেও অসুবিধে নেই।

শুক্রবার রাত করে অষ্টদা হাওড়া স্টেশন পার হয়ে বাস-স্ট্যান্ডে এল। সেখান থেকে হাওড়া-বারুইপুর সিটিসি বাসে চেপে রাত এগারোটার পর মিশনের মেন গেট-এ নামল। দোকানগুলো শাটার নামাচ্ছে, দু-একটা রিকশা তখনও দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর আশায়। অষ্টদা উল্টোদিকের গলিপথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

মিনিট সাত-আট হাঁটার পরেই এলাচির মোড় এসে গেল। খালের ওপর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে মোড় নিল। চারদিক শুনশান। দূরের একটা আবাসনে ঢালাই-এর কাজ চলছে।

অষ্টদা সারা শরীর চাদরে মুড়ে নিল। তারপর পাকা সড়ক ধরে এগোতেই খাটাল। ওই তো কলা-বাগান! সামনের ফাঁকা মাঠে ভূতেরা কই! ভাবতে ভাবতে চশমাটা পরে ফেলতেই ভূত-সদস্যদের দেখতে পেল। বাইশ-তেইশ বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল অষ্টদার! সে-সময় প্রথম থ্রি-ডি সিনেমা দেখতে গিয়ে পর্দায় নানা রঙের রেখা ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি অথচ চশমা পরতেই সব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। অষ্টদার মনে হল সে যেন আবার সেই থ্রি-ডি সিনেমা দেখতেই চলে এসেছে।

রাস্তার ওপর চট পাতা। ভূতেরা কেউ কেউ সেখানে বসেছে, কেউ কেউ খালের অল্প জলে গা-ডুবিয়ে বসে আছে। কেউ আবার কলাবাগানের ভেতর দেহ লুকিয়ে স্রেফ মুখটি বের করে বসে আছে। অষ্টদা দেখল স্টেজ বাঁধা হয়নি তবে খালের ধারের খেজুর গাছে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চিনতে পারল সে—তারই রেস্তোরাঁর বাণেশ্বর। নিশ্চয়ই এই গাছ থেকেই সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবে। উল্টোদিকের পাশাপাশি দুটো খেজুর গাছে কারা যেন দু'জন বসে আছে। সম্ভবত এরাই বক্তা।

জিনস্-এর প্যান্ট আর লাল-কালো গেঞ্জি পরা একটা ভূত কাছাকাছি আসতেই বিকট আঁশটে গন্ধে অষ্টদার নাক জ্বলে যাবার উপক্রম। ভূতটা বলল, 'মশাঁয় কিঁ হাঁওড়ার সঁদস্য।' অষ্টদা নাকে রুমাল চেপে মাথা নাড়ল। আরও কিছু বলত হয়তো কিন্তু অষ্টদার অস্বস্তির কথা ভেবেই বোধহয় সরে গিয়ে খালের জলে ডুব দিল।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা পঞ্চান্নয় খেজুর গাছের মাথায় থাকা বাণেশ্বর সঞ্চালনার কাজ শুরু করল। বলল, ভাইসব, আমরা এই যৌথ সম্মেলনে যোগদান করেছি আমাদের ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করতে আর অস্তিত্বের সংকট থেকে নিজেদের বাঁচাতে। দুই বিষয়ে আলোকপাত করবেন যথাক্রমে আমাদের প্রধান অতিথি এবং সভাপতি। তাঁরা উল্টো-দিকের খেজুর গাছে অপেক্ষা করছেন। আপনারা সব শান্ত হয়ে বসুন। হাওড়া ও কলকাতার ভূতেদের এই যৌথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের মধ্যে প্যাকেট ও চা-বিতরণ করা হচ্ছে, সুশৃঙ্খলভাবে তা গ্রহণ করুন। প্যাকেটে হাওড়ার আমতার বিখ্যাত পান্তুয়া আছে চারটি করে আর আছে কলকাতার বিশুদ্ধ ঘিয়ের লাড্ডু। সঙ্গে একশো গ্রাম করে ঝুরিভাজার পলিপ্যাক। খাওয়া শুরু করুন, চা আসছে। এই বলে একটু থামল বাণেশ্বর।

অষ্টদা ততক্ষণে প্যাকেট পেয়ে গেছে। পান্তুয়া খেয়ে দেখল বেশ টেস্ট। তারপর লাড্ডুতে কামড় বসাল। আহা! এমন অপূর্ব স্বাদ সে তার জীবনে প্রথম পেল।

ইতিমধ্যে বাণেশ্বর চলে এসেছে পরিচয়-পর্বে, ওই দেখুন দু'নম্বর খেজুর গাছে বসে আছেন এই সভার প্রধান অতিথি। মানবজন্মে উনি ছিলেন মিহির কুমার খাসখেল—হাঁপানি রোগে মৃত্যু হওয়ায় ভূতজন্মে নাম হয়েছে মিহির কুমার হাঁপানিখেল, এবার উনি ভৌতিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখবেন।

মিহির কুমার শুরু করলেন তাঁর হাঁপানির খেল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে লাগলেন—ভাইসব, মানুষ আ-আ-মাদের ভয় কে-ন-ন পায় না জানেন! ওইসব লেখক যা-যা-রা ভূতকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে হাসি-ঠাট্টা করে লেখালিখি করছে তাদের জন্য। বাচ্চাগুলোও ভয় পেতে ভুলে গেছে। সে-সে-দিন দু-দুটো ক্লাস নাইনে পড়া ছেলেমেয়ে বলাবলি করছিল বাবা-কাকারা কত সব ভূতের ভয়ের গল্প বলত। ওফ্ যদি একটা ভূতকে পেতাম না। রোজ আমার বইয়ের ব্যাগটা বইয়ে নিতাম, কম্পিউটারে টাইপ করিয়ে নিতাম। কত কী যে করতাম না কী বলব! ভয় দেখাব কী নিজেই ভয়ে পালিয়ে বাঁচি।

তবে এভাবে ভয়ে ভয়ে তো বাঁচা যায় না। তাই একদশকে আমাদের কলকাতার ভূতেদের কর্মপদ্ধতি অনেক বদলে ফেলতে হয়েছে। এখন আর পুরানো দরজার ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ—টুপটাপ্ জলপড়ার শব্দ বা জিভ-ভ্যাঙানি নয়, নতুন একদম সর্বাধুনিক রীতির প্রয়োগ করতে হবে। এই যে কলকাতায় এত আগুন লাগছে, মানুষ তদন্ত কমিটি গড়ে রিপোর্ট দিচ্ছে শর্ট-সার্কিট। আসলে সে-সব তো আমাদেরই কাজ অথচ ওরা ভাবছে ভূত তো আগুনকে ভয় পায়, তারা আবার আগুন লাগাবে কী করে! কাজেই ভৌতিক কাণ্ড বলতে পারছে না। যে-সব ছেলেমেয়ে ভূত নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে, সেখানে সশরীরে গেলে হবে না—শরীর অদৃশ্য রেখে শুধু দু'হাত দিয়ে কষে দুটো কান মলে দিয়ে চলে যাও—দেখি ভয় পায় কি না পায়! কিংবা শরীর লুকিয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে ল্যাং দাও, দ্যাখো ভয় পায় কিনা! মোট কথা যুগের তালে তাল দিয়ে কর্মপদ্ধতির সংশোধন করলে মানুষ ভয় পেতে বাধ্য। এই বলে বক্তব্য শেষ করছি।

হাঁপানির বক্তব্য শেষ হতেই খুব হাততালি পড়ল। বাণেশ্বর বলল, এতক্ষণ সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা রাখলেন প্রধান অতিথি মিহির কুমার। এবার অস্তিত্বের সংকট বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন এই সভার সভাপতি নীতিবাগীশ প্যাঁচড়াওয়ালা। মানবজন্মে ওনার নাম ছিল নীতিবাগীশ আগরওয়ালা। কলকাতায় দশ-দশটি লাড্ডুর দোকান। তাঁর দোকানের সুস্বাদু লাড্ডুই প্যাকেটে ছিল। খেয়েছেন সকলে। মানবজন্মের শেষ পর্যায়ে ওঁর সারা শরীর প্যাঁচড়ায় ভরে গিয়েছিল। তাই ভূতজন্মে নাম হয়েছে নীতিবাগীশ প্যাঁচড়াওয়ালা। বক্তব্য রাখছেন তিনি।

শুরু করলেন প্যাঁচড়াওয়ালা, ভাইসব, হামারা অস্তিত্ব সংকটমে হ্যায়! আমাদের বাঁচতে হোবে আর বাঁচতে হলে হামাদের সংরক্ষণ চাই। দ্যাখেন জলদাপাড়ামে—গোরুমারামে গণ্ডার সংরক্ষণ চলছে, গুজরাটকা গিরমে যা কর দেখেন সিংহ-সংরক্ষণ হো রহা হ্যায়, তো জিলায় জিলায় ভূত-সংরক্ষণ কেন্দ্র কিঁউ না হোবে! হাম সব মিলকর এক দাবি সনদ মানুষকা পাস পেশ করেঙ্গে—হামাদের সংরক্ষণ চাই। জরুরি হো তো সংবিধান সংশোধন করকে ভি সংরক্ষণ দিতে হোবে!

সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ঝড় উঠল। সেই দমকা হাওয়ায় অষ্টদার চাদর খুলে উড়ে যেতেই ভূতেরা বলতে লাগল, 'মাঁনুষ এঁসেছে মাঁনুষ, ওঁর ঘাঁড় মঁটকাও।' মুহূর্তে কে যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। নরেন্দ্রপুরের মন্দিরগেটের কাছে মাটিতে নেমে অষ্টদা দেখল বাণেশ্বর বলছে, খুব জোর বেঁচে গেলেন কিন্তু! বন্ধুর বাড়ি এখানেই তো!

অষ্টদা সেই বিরাট অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ওই দোতলায় থাকে আমার বন্ধু, খুব ভালো আবৃত্তি করে।

ততক্ষণে বাতাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে বাণেশ্বর ওরফে ছোটো মামদো।

—

ছবি ঃ আশিস ভট্টাচার্য

ভাস্কর দাশগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

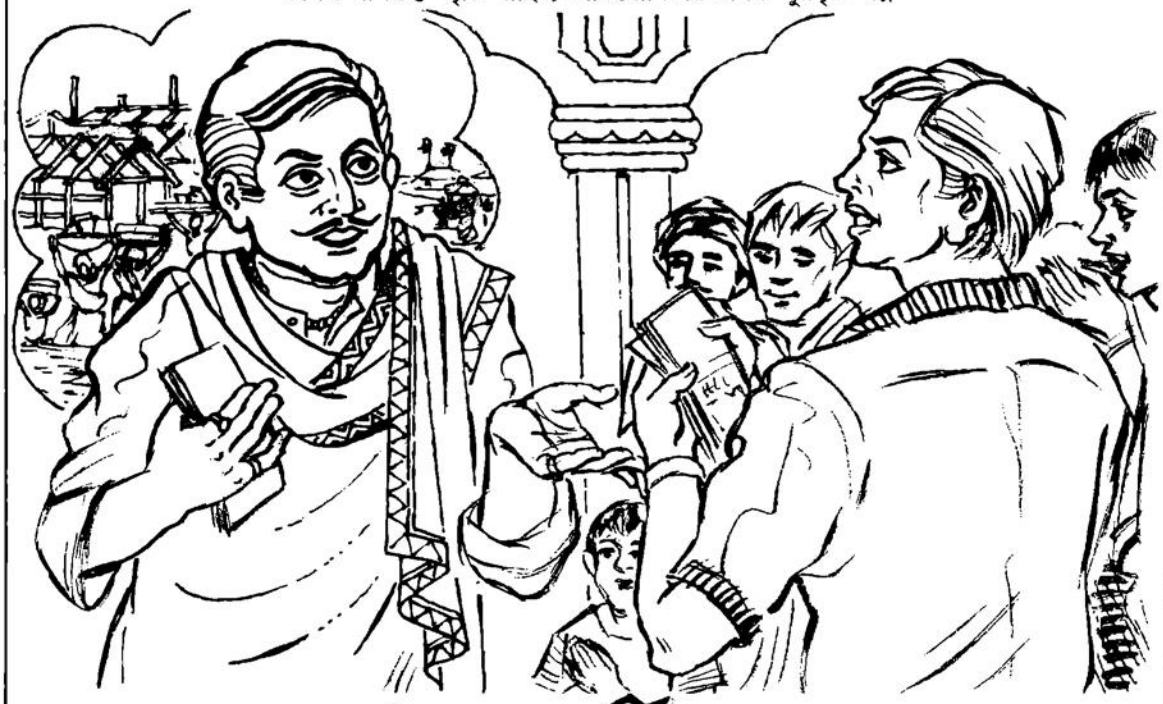

প্রেম-গোবিন্দ

সুকন্যা দে

চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে ভাঁড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে পিকলু বলল, 'এবারে কিন্তু পুজোটা বেশ ঘটা করে করতে হবে, হাবু!' পিকলুর কথায় হাবু সবকটা দাঁত মেলে ধরে বলল, সে আর বলতে দাদা! তবে বড় করে করতে গেলে খরচাটাও তো বেশি পড়বে! অত টাকা আসবে কোথা থেকে?' তপু বলল, 'এবারে না হয়, সবার থেকে একটু বেশি করে চাঁদা নেওয়া হবে। মায়ের পুজো বলে কথা! মনে হয় না কেউ না বলবে বলে!' 'তাছাড়া, পাশের গ্রাম থেকেও না হয় চাঁদা তোলা হবে। সব মিলিয়ে ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, দেখিস!' পিকলু বলল, 'তাহলে আর দেরি নয়, সবাই কাজে লেগে পড়। দিন তো এগিয়ে এল!'

বাতাসপুর গ্রামে প্রতি বছরই এই কালীপুজো বেশ ধুমধাম করেই সম্পন্ন হয়। পিকলুরা কয়েকজন মিলে এই পুজো করে। গ্রামের সকলেই যথাসাধ্য চাঁদা দিয়ে ওদের সাহায্য করে। অবশ্য পিকলুরা কখনও চাঁদা নিয়ে জোরজুলুম করে না। তবে গ্রামের একজনের সঙ্গেই ওদের সম্পর্ক ভালো নয়, তিনি হলেন বড় ব্যবসায়ী গোবিন্দ মুখুজ্যে। হাজার চেষ্টা করেও ছেলেরা কেউ ওনার কাছ থেকে পাঁচ টাকার বেশি চাঁদা আদায় করতে পারেনি। এ বছরও অবশ্য সে ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটল না। গ্রামের সবাই বেশি করে চাঁদা দিলেও কৃপণ গোবিন্দ নিজের সিদ্ধান্ত বদল করলেন না। চাঁদার কথা শুনে প্রথমে চশমার ফাঁক দিয়ে একবার সকলকে দেখে নিলেন। তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'মা-কে আনতে গেলে যে এত টাকা খরচ করতে হয়, তা তো আমার জানা ছিল না! আমি তো জানি, মনে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকলেই মাকে আনা যায়। তার জন্য এত খরচ করার কী দরকার? ঠিক আছে, তোমরা যখন বড়মুখ করে এসেছ, তখন মায়ের ফল-মিষ্টির জন্য কুড়িটা টাকা দিচ্ছি!'

'কুড়ি টাকা! এখন কুড়ি টাকায় কী হয় কাকাবাবু?' মুখটা ব্যাজার করে বলল তপু।

'কী বলছ কী! জানো আমার একদিনের খরচ মাত্র দশ টাকা। আর তুমি বলছ কুড়ি টাকায় কী হয়! ওতে মায়ের দু'দিনের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। না না, ওর বেশি আমি দিতে পারব না বাপু!'

ছেলেরা কুড়ি টাকা নিয়েই হতাশ হয়ে ফিরে এল।

'দেখলি তো, লোকটা কী বদমাশ! মাত্র কুড়ি টাকা! ওর কি পয়সার অভাব? চাইলেই পাঁচশো টাকা দিতে পারত, কিন্তু দিলে?' পিকলু তো রেগে কাঁই। তপু বলল, 'আমাদের কটা বেশি টাকা দিতে ওঁর এত কষ্ট, অথচ শুনলাম, সেদিন নাকি ওই বুড়ো কাকার গরুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার জন্য পুরো হাজার টাকা খরচ করে ডাক্তার- ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।' বুলু জানাল, 'আর একটা গুণের কথা শুনবি? উনি

নাকি প্রতিদিন সকালে পাড়ার সব পশুপাখিদের খাবার খাওয়ান!' লোকটা পশু-পাখিদের পিছনে খরচ করতে পারে, আর আমাদের পুজোর চাঁদা দিতে যত কষ্ট। দাঁড়া না, ব্যাটাকে দেখাচ্ছি মজা! এমন জব্দ করব যে ওর কৃপণপনা ঘুচে যাবে।' পিকলু দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক দৈব দুর্বিপাকে পড়ে পিকলুদের সব পরিকল্পনাই ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

পুজোর দিন পাঁচ আগে থেকে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে বলার কথা নয়। প্রকৃতি যেন ফুঁসে উঠেছে। বহু দিনের জমা আক্রোশ যেন বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসছে। দু-দিনের টানা বৃষ্টিতে বাতাসপুরের পাশাপাশি তিন-চারটে গ্রাম প্রায় জলের তলায়। পিকলুদের পুজো মাথায় উঠল। বন্যায় মানুষজনের বাড়িঘর ডুবে গেছে, ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, পশুরা জলে ভেসে গেছে। পিকলুরা চারপাশের অবস্থা দেখে ঠিক করল তারা সবাই মিলে এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য কিছু করবে। সরকার থেকে ত্রাণ আসতে এখনও অনেক দেরি। তাই তাদেরই সব ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু তার জন্য প্রথমেই দরকার ওই অসহায় মানুষগুলোর জন্য একটা নিরাপদ বাসস্থান। কিন্তু কে দেবে এদের আশ্রয়! যাদের সামর্থ্য আছে তারা আশ্রয় দেওয়া তো দূর অস্ত, দুটো টাকা দিয়েও সাহায্য করতে রাজি নয়। অথচ এরাই মায়ের পুজোর জন্য হাসিমুখে বেশি চাঁদা দিতে রাজি ছিল। পিকলুরা হতাশ হয়ে পড়ল, এতগুলো মানুষকে তারা বিপদ থেকে কীভাবে রক্ষা করবে ভেবে পেল না। ঠিক এই সময় ভগবানের আশীর্বাদের মতো এসে হাজির হলেন কৃপণ গোবিন্দ।

'কী হল! তোমরা কী এত ভাবছ! যাও, ওদের নিয়ে এসো। আমার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে। জল না কমা পর্যন্ত ওরা এখানেই থাকুক। আর যদি এখানে না কুলোয়, তাহলে আমি স্কুলবাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও করে দেব।

পিকলুরা হতবাক হয়ে গেল মানুষটার কথা শুনে।

অনেক পরিশ্রম করে গ্রামে গ্রামে নৌকা নিয়ে মানুষগুলোকে উদ্ধার করে এনে গোবিন্দবাবুর বাড়িতে তুলল পিকলুরা। বাড়ি ও স্কুল মিলিয়ে প্রায় শ-দেড়েক মানুষ আশ্রয় পেল। এরপর তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি। নিজের গুদাম থেকে চাল-ডাল-সবজি সব বের করে দিলেন, অসুস্থদের জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। পিকলু-হাবু-তপু-বুলু, আরও অনেক ছেলে তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। গোবিন্দবাবু নিজের হাতে রান্না করে সকলকে যত্ন করে খাওয়ালেন। প্রত্যেকে তাঁর জয়-জয়কার করতে লাগল। বন্যার জল ক্রমশ কমতে লাগল, কিন্তু সরকার থেকে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছাল না। একসময় সব জল নেমে গেল, কিন্তু হলে কী হবে, মানুষগুলো ফিরে যাবে কোথায়? ঘরবাড়ি তো ভেঙে জলের নীচে চলে গেছে। এবারও ত্রাণকর্তা হলেন গোবিন্দবাবু। সিন্দুক খুলে হাজার হাজার টাকার নোটের বান্ডিল তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে এদের বাসস্থান তৈরি করে দেবে। আরও কিছু লাগলে চেয়ে নিও, লজ্জা কোরো না যেন।'

গোবিন্দ মুখুজ্জের এই রূপ দেখে পিকলুরা অবাক হয়ে গেল। এ কোন গোবিন্দ! পাড়ায় সবাই যাকে হাড়-কৃপণ বলে চেনে, তার মধ্যে যে একটা উদার মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে তা তাদের কল্পনারও অতীত। এই মানুষটাকেই তারা জব্দ করার পরিকল্পনা করছিল। ভুল বুঝতে পেরেই তারা গোবিন্দবাবুর পা ধরে ক্ষমা চাইল, 'মাফ করবেন কাকাবাবু। আপনি যখন সেদিন মায়ের পুজোর জন্য কুড়ি টাকার বেশি চাঁদা দিলেন না, তখন আপনার ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল। অথচ এ ক'দিনে আপনি ওই অসহায় মানুষগুলোর জন্য যেভাবে অকাতরে সব বিলিয়ে দিলেন তা দেখে আমাদের নিজেদেরই লজ্জা লাগছে একথা ভেবে যে, আমরা আপনাকে এতদিন ভুল ভেবেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।'

গোবিন্দবাবু সামান্য হেসে বললেন, 'তোমরা সেদিন মাটির মায়ের জন্য টাকা চেয়েছিলে, তাই ওর বেশি দেবার প্রয়োজন আমি মনে করিনি। কিন্তু এই জীবন্ত মানুষগুলোর জন্য যদি আমি কিছু না করতাম তাহলে হয়তো ঈশ্বরও আমাকে কখনও ক্ষমা করতেন না। আমি মনে করি, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবান বাস করেন। তাই জীবের সেবা করা মানেই ঈশ্বরের সাধনা করা। তাই বলছি, মাটির ভগবানের জন্য খরচ কমিয়ে জীবন্ত ভগবানের সেবা করো, দেখবে নিশ্চয়ই ফল পাবে।'

—

বিজ্ঞপ্তি

দেব লাইব্রেরি, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ টেলিফোন নম্বরের পরিবর্তন হয়েছে। এখন থেকে অনুগ্রহ করে পুরনো নম্বরের বদলে দেব লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে নতুন নম্বর ৬৫৫০-৪২৯৫-এ ফোন করতে হবে।

ভাস্কর দাশগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

আনন্দ নিকেতন

মানিকলাল মজুমদার

মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার সুবাদে ডাক্তারদের কাছ থেকে দেখার ও জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কাজের জন্য নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয়েছে। তারই একটা আজ আমি তোমাদের বলছি।

বহরমপুর শহর চিকিৎসকদের স্বর্গরাজ্য। যে ডাক্তার কলকাতায় তেমন পসার জমাতে পারেন না, বহরমপুরে কোনোরকমে একটু জায়গা করে নিতে পারলে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় না। নেমপ্লেটে শুধু কলকাতা নামটা জুড়ে দিলেই হল।

আমার কোম্পানি থেকে বলল, মি. মজুমদার, যে করেই হোক বহরমপুরের মার্কেটটা আপনাকে ধরতেই হবে। তাতে যদি ডাক্তারদের বিনা পয়সায় বিদেশ ঘোরার অফার দিতে হয় আপনি পিছ-পা হবেন না। মনে রাখবেন সাকসেস্ হলে আপনারও প্রোমোশন হবে।

প্রোমোশনের লোভে আমিও ছুটলাম। ডাক্তারদের ডিসপেনসারি চিনতে আর তাঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই আমার একটা দিন চলে গেল। তবে একটা সুবিধা দেখলাম, এখানে রানিবাগান আর চার্চ থেকে মোহন হাউসের মোড় পর্যন্ত বহরমপুরের সিংহভাগ ডাক্তারের ডিসপেনসারি।

খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি ডাঃ এস. কে. বর্মন এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাক্তার। তাঁর যেমন ভিজিট বেশি, তেমন হাতযশ। তাঁকে দেখাতে গেলে তিনদিন আগে থেকে নাম লেখাতে হয়।

এরকম ডাক্তারই তো আমার চাই। পরদিন ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম। আমাদের এই পেশাতে তাড়াহুড়ো বলে কোনো চ্যাপ্টার নেই। খুব ব্যস্ত ডাক্তারবাবুকেও এমনভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, যাতে তাঁকে বোঝানোর মতো কিছুটা সময় পাওয়া যায়। এর মধ্যেই ডাক্তারটার মোটিভেশন স্টাডি করতে হবে। সেই বুঝে তাঁকে টোপ দিতে হবে। বড় বড় ডাক্তারদের ক্ষেত্রে খুব সাবধানে এগোতে হয়।

আগে থাকতেই একটা ইলেকট্রিক আয়রন দিয়ে ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডারকে হাত করে নিয়েছিলাম। চেম্বারে ঢুকে ডাক্তারবাবুকে গুডমর্নিং জানিয়ে চেয়ারে বসতে বসতেই বললাম, একটু জল হলে ভালো হত ডাক্তারবাবু।

আমার লক্ষ্য এই সুযোগে ডাক্তারবাবুকে যা বোঝানোর বুঝিয়ে নিতে হবে। আর আমাকেও ডাক্তারবাবুকে স্টাডি করে নিতে হবে। কম্পাউন্ডারকে বলাই আছে, সে একটু দেরি করবে।

ডাক্তারবাবু কম্পাউন্ডারকে জল দিতে বললেন, আমি আমার ওষুধের বায়োডাটা বের করে ডাক্তারবাবুকে বোঝাতে লাগলাম। আমাদের কোম্পানি কি কি ওষুধ প্রোডাক্ট করে, তাদের কম্পোজিশন কী কী।

শুনেছি ডাক্তারটি পয়সার পিশাচ হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। আর অফারের চেয়ে বিনা পয়সার ওষুধেই তাঁর বেশি লোভ। সেই কারণে সব প্রোডাক্টের ফ্রি স্যাম্পলই আমি বেশি করে নিয়ে গেছি।

ডাক্তারটা দেখলাম স্পষ্টবাদী। আমায় বললেন, আপনি আপনার ওষুধের বায়োডাটা দিয়ে যান, আমি আজ রাত্রে সেগুলো দেখব। আপনি কাল একবার এই সময়ে আসুন, আর

হ্যাঁ, কাল সব ওষুধের বেশি করে ফ্রি স্যাম্পেল আনবেন। যদি আপনাদের কম্পোজিশন ঠিক থাকে তাহলে কাল ফ্রি স্যাম্পল নেব। সেগুলো অ্যাপ্লাই করে যদি রেজাল্ট ভালো পাই তবে অবশ্যই আপনাদের ওষুধ প্রেসক্রাইব করব। তবে হ্যাঁ, তার বিনিময়ে আপনারা যে সব অফার-টফার দেন, সে সব আমি নেব না। তার বদলে আমি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটি ওষুধের ফ্রি স্যাম্পল নেব। আর সেটা কতগুলি করে তার চুক্তি পরে হবে।

এখানে থেকে বেরিয়ে আরও কিছু ডাক্তারকে ভিজিট করলাম। তাঁরা দেখলাম এর থেকেও ওপরে। ওষুধের গুণাগুণের থেকে অফারের দিকেই তাঁদের নজর বেশি। ভালো ভালো অফার তাঁদের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়ে মার্কেটটা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে ফেললাম। দু-একজন অবশ্য ডাক্তারের মতোই জানালেন, কম্পোজিশন আর স্যাম্পেল ফাইলের গুণাগুণ দেখে প্রেসক্রাইব করবেন।

পরদিন ডাঃ বর্মনের ডিসপেনসারিতে গিয়ে আশানুরূপ ফল পেয়ে মনটা প্রফুল্ল হয়ে গেল। তার জন্য অবশ্য অনেকগুলো ফ্রি স্যাম্পল দিতে হল। তা হোক, তবু মার্কেটটা তো পাওয়া যাবে। আরও কিছু ডাক্তারকেও আজ ভিজিট করা হল। মোটামুটিভাবে বহরমপুরে আসাটা বোধহয় সার্থক হল।

তিনদিন ধরে দৌড়ঝাঁপ করে আর টেনশনে কাটিয়ে আজকে একটু হালকা লাগছে। তাই ভাবলাম বহরমপুরে যখন এসেইছি, যাই খোসবাগে মামার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসি।

দুপুরে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলাম। খোসবাগ যাওয়ার রাস্তা এত খারাপ যে আধঘণ্টার রাস্তা পৌঁছতে প্রায় একঘণ্টা লেগে যাবে। বাসটা ফাঁকা থাকলেও বসার জায়গা না পাওয়াতে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

অর্ধেক রাস্তা গেছি এমন সময়ে এক বিপদ। বাসের চাকা একটা গাড্ডায় পড়ে এমন একটা ঝাঁকুনি খেল, আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়ে একটা রডে কপালে জোর আঘাত পেলাম। কপাল ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে রুমাল চাপা দিয়ে ধরি। তাতেও রক্ত বন্ধ হয় না। একজন উঠে গিয়ে আমায় বসতে দিল। কন্ডাকটার বললেন, দাদা একটু কষ্ট করেন। সামনে আনন্দ নিকেতনে নামিয়ে দেব, ওখানে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নেবেন।

রক্ত এখনও থামেনি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ভাবছি কখন আসবে ওষুধের দোকান। কিছুটা গিয়ে ড্রাইভার বাস থামাতেই কন্ডাকটার বললেন, দাদা এখানে নামুন, ওই যে আনন্দ নিকেতন। তারপর আমার হাতে টিকিটের মূল্য ফেরত দিয়ে বললেন, ঘণ্টাখানেক পরে একটা বাস আছে।

প্রায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে দরমা ও টালি দিয়ে ঘেরা একটা আশ্রমের মতন। আশেপাশে কোনো দোকানই চোখে পড়ল না। অথচ এই মুহূর্তে আমার একটু চিকিৎসার প্রয়োজন। হয়তো সেলাইও করতে হতে পারে।

কী করব ভেবে না পেয়ে আশ্রমের দিকেই পা বাড়ালাম। ভেতরে গিয়ে দেখলাম এটা একটা চিকিৎসা কেন্দ্রই বটে। এমার্জেন্সিতে যেতেই একজন কম্পাউন্ডার আমার কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে সেলাই করে দিলেন। একজন ডাক্তার প্রয়োজনীয় ওষুধ দিলেন। তারপর জানতে চাইলেন আমি কোথা থেকে আসছি। আমি সমস্ত ঘটনাটা তাঁকে বললাম।

কত দেব জানতে চাওয়াতে ডাক্তারটি সামান্য হেসে বললেন, এখানে পয়সা লাগে না। এই এলাকায় বহু মানুষ আছেন যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যান। নয়তো জমি-জায়গা যেটুকু আছে তা বেচে ডাক্তারের হাতে তুলে দেন। তাই আমরা কয়েকজন ডাক্তার মিলে এই আনন্দ নিকেতন গড়ে তুলেছি।

ডাক্তারের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পৃথিবীটা অমানুষে ভরে গেলেও, এখনও যে মানুষ আছে এটা তারই প্রমাণ। ডাক্তারটির কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আপনাদের এই কর্মযজ্ঞে আমারও তো সামিল হতে ইচ্ছে করছে। তবে আমার ক্ষমতা তো সামান্য। ডাক্তারদের ফ্রি স্যাম্পেল দেওয়ার জন্য যে ওষুধ পাই, তার থেকে যতটা বাঁচাতে পারব আপনাদের দিয়ে যাব।

ডাক্তার খুশি হয়ে আনন্দ নিকেতনটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন, সকলের একটু একটু সাহায্যই এই নিকেতনকে টিকিয়ে রেখেছে। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্র্যাকটিস সেরে কিছুটা করে সময় নিকেতনকে দিই। তবে এই নিকেতনের যিনি স্রষ্টা, আমাদের স্যার, তিনি তাঁর সবটুকুই নিকেতনকে দিয়ে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

আমি বললাম, সেই মহান ব্যক্তিটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

ডাক্তার বললেন, একটু অপেক্ষা করে যান। স্যারের আসার সময় হয়ে গেছে।

আমাদের কথা শেষ না হতেই ফুল হেলমেট পরে একজন বাইক আরোহী নিকেতনে ঢুকলেন। ডাক্তার বললেন, ঐ তো স্যার এসে গেছেন।

ভদ্রলোক হেলমেট খুলতেই আমি তো ভূত দেখার মতন চমকে উঠলাম। বললাম, স্যার আপনি!

উনিও আমায় দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, আপনি! এই অবস্থা কী করে হল?

আমি কী করে এই অবস্থা হল বললাম। আপনারা দুজন দুজনকেই চেনেন দেখছি।—বলে ডাক্তার স্যারের ডিকি থেকে আমারই দেওয়া স্যাম্পেল ওষুধগুলো বের করতে লাগলেন।

অতগুলি স্যাম্পেল ফাইল দেওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টা আগে যে মন খারাপ হচ্ছিল, তার জন্যই এখন একটা ভালো লাগায় মনটা ভরে গেল। কোম্পানির থেকে আরও কী করে বেশি স্যাম্পেল ফাইল বের করা যায় এই মুহূর্তে সেই চিন্তাটাই মাথায় এল। ওষুধগুলো যে অপাত্রে ফেলে দেওয়া হয়নি, ভালো লাগাটা অবশ্য তার জন্যই।

ভাস্কর দাশগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার তৃতীয় পুরস্কৃত গল্প

কোথা ছাড়ি খুঁজিছ ঈশ্বর

প্রার্থনা পাঠক

কদিনই বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার এটাই তো শুভ সময়। বহুদিন একবার চাকলাধামে বাবা লোকনাথকে দর্শন করার ইচ্ছা ছিল। তাই বন্ধুদের কাছে প্রস্তাবটা দিয়েই বসলাম। বন্ধু মানে আমি, পামেলা আর অনুভব; তিনজনই একই কলেজে পড়ি একই বিষয় নিয়ে। প্রস্তাব দিতেই অনুভব বলল, হ্যাঁ রে ওলি, আমার মাও তো লোকনাথবাবার ভীষণ ভক্ত, পারলে মাকেও নিয়ে নিই, কি বলিস?

আমি বললাম, এটা আবার বলার আছে নাকি? কাকিমা গেলে তো আমাদের ট্যুরটা একদম জমে যাবে রে!

সকলে মিলে ঠিক করলাম চৌঠা জুন যাব, কারণ সেদিন ভিড়টা একটু কম থাকবে। বাড়িতে জরুরি কাজ থাকায় আমার বাবা-মাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। তাই ঐ দিন আমি, পামেলা, অনুভব আর অনুভবের মা রওনা হলাম টানা প্রাইভেট গাড়িতে চেপে। অনুভবের মা রতিকাকিমা বেশ রসিক মানুষ। তিনি মজা করলেন, জানিস কতদিন ভালো-মন্দ খাইনি, রোজকার ডাল-ভাত আলু-চচ্চড়িতে মুখ একেবারে তেঁতো হয়ে গেছে, শুনেছি ওখানে আশ্রমে দারুণ খাওয়ায়, ভালো জমবে, বল?

আমরা হেসে ফেললাম। কখনও রসিকতা, কখনও ঈশ্বর আলোচনায় প্রায় তিন ঘণ্টা পর পৌঁছলাম গন্তব্যে। শান্তশিষ্ট জায়গা। সাদা শ্বেত পাথরের বিশাল মন্দির, সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা, ধারে ধারে সবুজ গাছ- গাছালিও রয়েছে বেশ গায়ে গা লাগিয়ে। মিষ্টি একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ জায়গাটাকে মোহময় করে রেখেছে। মন্দির থেকে মৃদু ঘণ্টা-ধ্বনি ভেসে আসছে। মন্দিরের অন্দরে লোকনাথ-বাবার দুটি বিগ্রহ দর্শন করার পর তাতে ফুলের মালা দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। বটগাছের নীচে একটা বাঁধানো সিমেন্টের চাতালে সকালের মিঠে রোদের স্পর্শে আপাতত আশ্রয় নিলাম ক্লান্ত আমরা চারজন। মন্দির চত্বরে দেখলাম অগণিত ভক্তের সমাগম। সেদিনও বেশ কিছুটা ভিড় আছে। ভক্তদের আনাগোনা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ল মন্দিরের বাঁ দিকের কোণটায়। এক বৃদ্ধ বসে চাটাই-এর ওপর, পরনে মলিন থান, চোখে-মুখে নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, সামনে ছোট একটা তোবড়ানো আঁকাবাঁকা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে আমি ও অনুভব এগিয়ে গেলাম। শীর্ণকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সামনের বাটিতে হাতে গোনা গুটিকয়েক কয়েন। বাটিতে পাঁচ টাকার খুচরো দিলাম। দেখে কেমন মায়া হল।

আপনারা এখানেই থাকেন বুঝি?

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করে আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, আর বোলো না বাবা, আমার স্ত্রী আগে এই মন্দিরের কর্মচারী ছিল, মন্দিরের ছোটখাটো কাজ করত, কোথা থেকে কী এক রোগ এসে...বলে একটু থামলেন, গলাটা বুজে এল মনে হল। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, এখন শরীরটা

খুব খারাপ, মাঝে মাঝে খুব জ্বর আর কাশি, কখনো কখনো রক্তও ওঠে, ডাক্তারবাবু বলেছেন সারাতে বেশ কিছু টাকা লাগবে। ভিক্ষে করে দিন চলে, দু'বেলা খাওয়াই জোটে না ভালো! অতগুলো টাকা কোথা থেকে পাব বলো তো?

অনুভবের কণ্ঠে সমবেদনা, এখানেই থাকেন?

ক্ষীণস্বরে বৃদ্ধ বললেন, আমাদের সন্তান-সন্ততি নেই, একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, দু'মাসের ভাড়া না দেওয়ায় তাড়িয়ে দিল জানো! মন্দিরের কয়েকটা ছেলে বলল, তাই এখানেই থেকে গেলাম। ওধারে যে একটা ছোট্ট ঘর আছে, শীত-বর্ষা ওখানেই থাকি বুড়ো-বুড়ি মিলে। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেয় ওরা এই অনেক বাবা। ওর অবস্থাও দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে একটু সাহায্য চেয়েছি, আজ নয় কাল নয় করে ওরা কিছুই দিচ্ছে না। আমরা যে কী অবস্থায় আছি তা শুধু ভগবানই জানেন। আর কী বলব, বাবা।

এই বলে থামলেন বৃদ্ধ। আমরা স্তব্ধ। এতক্ষণে পামেলা আর রতিকাকিমাও এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাশে। ওদিকে মাইকের ঘোষণা কানে এল, 'যাঁরা বাবার জন্য অর্থ দান করতে চান তাঁরা ডানদিকের ডোনেশন ক্যাম্পের সামনে চলে যান, নীরবতা বজায় রাখুন।'

পামেলা হাতে টান মারল, কী রে চল, যাবি না? লাইন পড়ে গেল তো....

আমি আর অনুভব চোখ চাওয়াচায়ি করলাম। পামেলাকে বললাম, তুই যেতে চাইলে যা, আটকাব না, কিন্তু শুধু শুধু টাকাগুলো ওখানে দিয়ে কোনো লাভ আছে কী?

রতিকাকিমা এতক্ষণ চুপচাপ থেকে মুখ খুললেন, কিছু টাকা এদের দিলেও তো হয়, তাই না?

আমি বললাম, এটাই ভাবছিলাম কাকিমা। আমার মুখের কথাটাই একদম কেড়ে নিলেন। তবে কিছু নয়, ভাবছি যদি পুরোটাই....

অনুভবও দেখলাম মাথা নাড়ল। একটা অদ্ভুত জেদ ও দৃঢ়তা চেপে ধরল মনকে। ভাবলাম, শুধু কয়েকটা খুচরো দিয়েই কি এদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সহজে এড়ানো যায়? পাঁচালিতে পড়া কথাগুলোও মনে এল— 'আমাকে পুজো করার প্রয়োজন নেই, দীনদরিদ্রের সেবা কর।'

রতিকাকিমার কথায় ঘোর কাটল, এই কথাগুলো শুনে কী যে ভালো লাগল!

প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও পামেলাও পরে রাজি হয়ে গেল। আর দেরি করলাম না, বাবার জন্য আনা এক হাজার টাকার নোট তুলে দিলাম ওঁদের হাতে। অনুভব হাত বাড়াল, এই নিন, কিছু টাকা রইল, পারলে এটা দিয়েই চিকিৎসা করাবেন, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন, আবার আসব। আমরা সকলে তো আপনাদের পাশে আছি। ভয় কি?

এতটা বোধহয় ভাবতেও পারেননি ওঁরা। দেখলাম বৃদ্ধার চোখে জল, বৃদ্ধ নির্বাক।

চারজনে নমস্কার করে বললাম, আমাদের আশীর্বাদ করবেন না?

এতক্ষণে বৃদ্ধা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথায় হাত রেখেছেন—বাবা, তোমরা আমাদের কাছে ভগবান! আজ আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের দিন। আমরা যেন ঈশ্বরের দেখা পেলাম। এ তো স্বর্গসুখ। তোমাদের যে কী বলে আশীর্বাদ করি, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

এই বলে মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলেন। চোখের জল মুছে বললেন, তোমাদের মতো মানুষ বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাক, তাহলে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। বৃদ্ধ তখনও হতবাক, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাদের দিকে; মাথা নাড়লেন

জানো কী!

- ☐ এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে বদনের। ডক্টর মিত্র বলেছিলেন, এখানে এলে বদনের সব ইচ্ছে পূরণ হবে। কিন্তু কোথায় কী.....
- ☐ শোনগিরি রাজ্যের মুখ্য ন্যায়াধীশ তিনি। আজও সকাল থেকে সব কাজ অবিচলিতভাবে করে যাচ্ছেন। কিন্তু দুপুরে তাঁকে এক নির্মম বিচার করতে হবে.....
- ☐ একশোটা ছেলেকে অনেক কষ্টে বড় করে তুলেছে মানুষটি। কিন্তু ছেলেরা বড় হতেই এসে বলে.....
- ☐ রুকুর ভীষণ মন কেমন করছে। স্কুল থেকে এসে দেখতে পায় না কাউকে.....কোথায় গেল ঠাম্মা-দাদু.....
- ☐ গ্রামে এসে এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করে পিকলু। শহর থেকে একদম আলাদা। সারাদিন শুধু হৈ চৈ আর মজা.....সবাই ব্যস্ত পিকলুকে নিয়ে.....

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে **শুকতারার অগ্রহায়ণ** সংখ্যায়। সঙ্গে আরও অনেক কিছু যা তোমাদের চমকে দেবেই। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, বিচ্ছুরা তো আছেই।

শুধু। চোখে-মুখে যেন আমাদের না ছাড়ার আকুতি।

আশ্রমে গিয়ে ভোগ খাওয়ার মতো ইচ্ছা আমাদের কারোর ছিল না। মন্দিরে ঢুকে বাবার বিগ্রহের সামনে বসে রইলাম কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাবা লোকনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ-পবিত্র শিহরন অনুভব করলাম শরীর-মনে। দেখলাম, তাঁর মুখ প্রশান্তিপূর্ণ, বরাভয়ময় দৃষ্টিতে যেন আশিস বর্ষিত হচ্ছে, মনটা এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠল। কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জানি না। সম্বিৎ ফেরে কাকিমার পিঠে রাখা হাতের স্পর্শে, কিরে কাঁদছিস কেন?

চোখ মুছে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলাম, হ্যাঁ চলুন কাকিমা।

সকলে মিলে ধীরে ধীরে মন্দিরের বাইরে এলাম। তখনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিষ্পলক আমাদের দিকে চেয়ে।

শুধু বারবার একটা কথাই মনে ভাসছে তখন.....

'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

ছবি ঃ সনৎ কুমার দাস

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে ঃ

অরুণাভ বোস চৌধুরী (ব্যারাকপুর, কল-১২২)।। তারক চট্টোপাধ্যায় (প্রান্তিকা, বাঁকুড়া)।। ছন্দা চক্রবর্তী (চুঁচুড়া, হুগলি)।। মনোরঞ্জন গরাই (দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া)।। অভিষেক দুবে (আদ্রা, পুরুলিয়া)।। অরিন্দম ব্যানার্জি (চন্দননগর, হুগলি)।। কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভালুকা, নদীয়া)।। সুমনা চৌধুরী (গড়িয়া, কল-৮৪)।। পূর্ণচন্দ্র শ্যমল (জুগিমোল, পশ্চিম মেদিনীপুর)।। চন্দন সোম (সিউড়ি, বীরভূম)।।

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরও পুরস্কার পাচ্ছ। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরা ঃ সুকন্যা দে, মানিকলাল মজুমদার, প্রার্থনা পাঠক, অরুণাভ বোস চৌধুরী ও তারক চট্টোপাধ্যায়।

ঘোষণা

শ্রীরামপুর, হুগলি থেকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জগবন্ধু গুছাইত ও তাঁর স্ত্রী মীরা গুছাইত তাঁদের পিতা কানাইলাল গুছাইতের (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রামনগর অতুল বিদ্যালয়, খানাকুল, হুগলি) স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কানাইলাল গুছাইত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

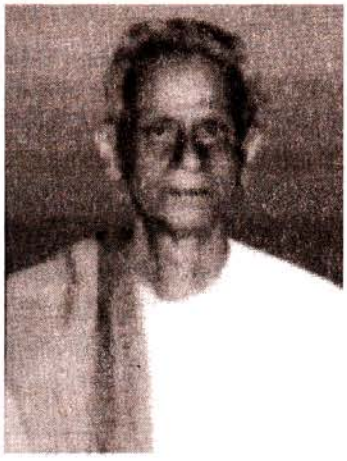

বিষয়বস্তু

আদর্শ শিক্ষক

লেখা পাঠাবার শেষ দিন **৩০ অগ্রহায়ণ**। পুরস্কৃত লেখা তিনটি শুকতারার আগামী **ফাল্গুন** সংখ্যায় ছাপা হবে।

কানাইলাল গুছাইত
জন্ম ঃ ২০ মাঘ ১৩২৯
মৃত্যু ঃ ৬ আষাঢ় ১৪০২

প্রথম পুরস্কার ঃ ৩০০ টাকা ☐ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ২০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ঃ ১০০ টাকা

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

মিষ্টি জলের হ্রদ

পৃথিবীতে এমন কিছু স্থান আছে যা শুধু বিস্ময়কর নয়, অভাবনীয়ও বটে। বৈকাল হ্রদ এমনই একটি জায়গা। সাইবেরিয়ার অন্তর্গত বিশাল এক মিষ্টি জলের হ্রদ। সমস্ত পৃথিবীর ২০% মিষ্টি জল এই হ্রদেই পাওয়া যায়। হ্রদটির বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ মিলিয়ন বছরের কাছাকাছি। বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ, এর গভীরতা ১৬৪২ মিটারের মধ্যে। যার মধ্যে প্রায় ১১৮৬.৫ মিটার গভীর সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় নীচে অবস্থিত। বৈকাল হ্রদের আয়তন ৩২ হাজার ৭২২ কিমি। এটি লম্বা ও বিশাল বড়ো একটি হ্রদ। এই হ্রদ একটা উপত্যকা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ও চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। শীতকালে এই অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯° সেন্টিগ্রেড ও গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪° সেন্টিগ্রেড। এই হ্রদে ১০ হাজার ৮৫ প্রজাতির উদ্ভিদ ও ১৫৫০ রকমের প্রাণী বসবাস করে। বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে বুরিয়াত নামে আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই হ্রদকে নবীন হ্রদ বলেন। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল হ্রদটি প্রতি বছর ২ সেমি. করে চওড়া হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কো বৈকাল হ্রদকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করেছে।

ঋভু মুখার্জি

(২, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, ফ্ল্যাট ৩ই, হাওড়া-৭০০ ০০১)

গোয়েন্দা সংখ্যা চাই

আমার আষাঢ় সংখ্যা ১৪২১ ভূতের গল্পগুলো খুব ভালো লেগেছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত পৃথ্বীরাজ সরকারের চিঠির সঙ্গে আমিও একমত। আমিও চাই গোয়েন্দা সংখ্যা হোক। এই পত্রিকায় কল্পবিজ্ঞান, বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প বা উপন্যাস বিশেষ প্রকাশিত হয় না। হলে খুশি হবো।

সুশান্ত চক্রবর্তী

(৬, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন, সিঁথি, কলকাতা-৫০)

বন্ধু তুমি শুকতারা

নবীন অথবা প্রবীণ প্রত্যেকের কাছে শুকতারা তুমি বন্ধুর মতো। অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে শুকতারা একাই একশো। এই কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সুদীর্ঘ ৬৭ বছর ধরে করে চলেছেন কর্তৃপক্ষ। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পোঃ ও গ্রাম–আয়দা কিসমৎ, হুগলি)

আমাদের ঠিকানা

সম্পাদক শুকতারা

(বিভাগের নাম)

২২/৪ সি, ঝামাপুকুর লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মনমাতানো ভৌতিক সংখ্যা

গত আষাঢ় মাসের ভৌতিক সংখ্যাটি আমাদের মন মাতিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি গল্প তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। গল্পগুলির মধ্যে আমার ভালো লেগেছে ড. গৌরী দে-র 'শয়তানের ভালোবাসা' ও সায়ন্তনী পলমলের 'মিতুল' গল্প দুটি। ফিরে দেখার গল্পটিও অনবদ্য।

বিজয় ঘোষাল

(দশম শ্রেণি, পোঃ ও গ্রাম-রামনগর পূর্বপাড়া, বীরভূম-৭৩১ ২৩৪)

তোমার-আমার সবার বন্ধু

শুকতারা নামটা শুনলেই মনের জানালায় এসে হাজির হয় বাঁটুল, বিচ্ছু, হাঁদাভোঁদা। এছাড়া দাদুমণির চিঠি, কুইজ-কুইজ, জানা-অজানা, তোমাদের পাতা, মজার পাতা ইত্যাদি। এছাড়া আছে ম্যাজিক সেই সঙ্গে নানা মজার গল্প, নানা কবির কবিতা ও লেখকদের গল্প সবই ভালো লাগে।

রূপা দে

(প্রযত্নে—শুভাশিস দে, কাঁপা লেক রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা)

মজাদার গল্প

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ফিরে দেখা বিভাগে নির্মলেন্দু গৌতমের 'মামা-ভাগ্নে সংবাদ' গল্পটি পড়ে খুব মজা পেয়েছি। এই ধরনের মজাদার গল্প আরও বেশি করে পড়তে চাই। ম্যাজিকে 'জাপানের চালাকি' খুবই চমকপ্রদ লাগল। বিজ্ঞানের খবরও দারুণ।

দেবদাস মণ্ডল

(গ্রাম-মেটিয়ারি, পোঃ প্রতাপনগর, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা-৭৪৩ ৩৩০)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নীচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম)

সম্পূর্ণ ঠিকানা

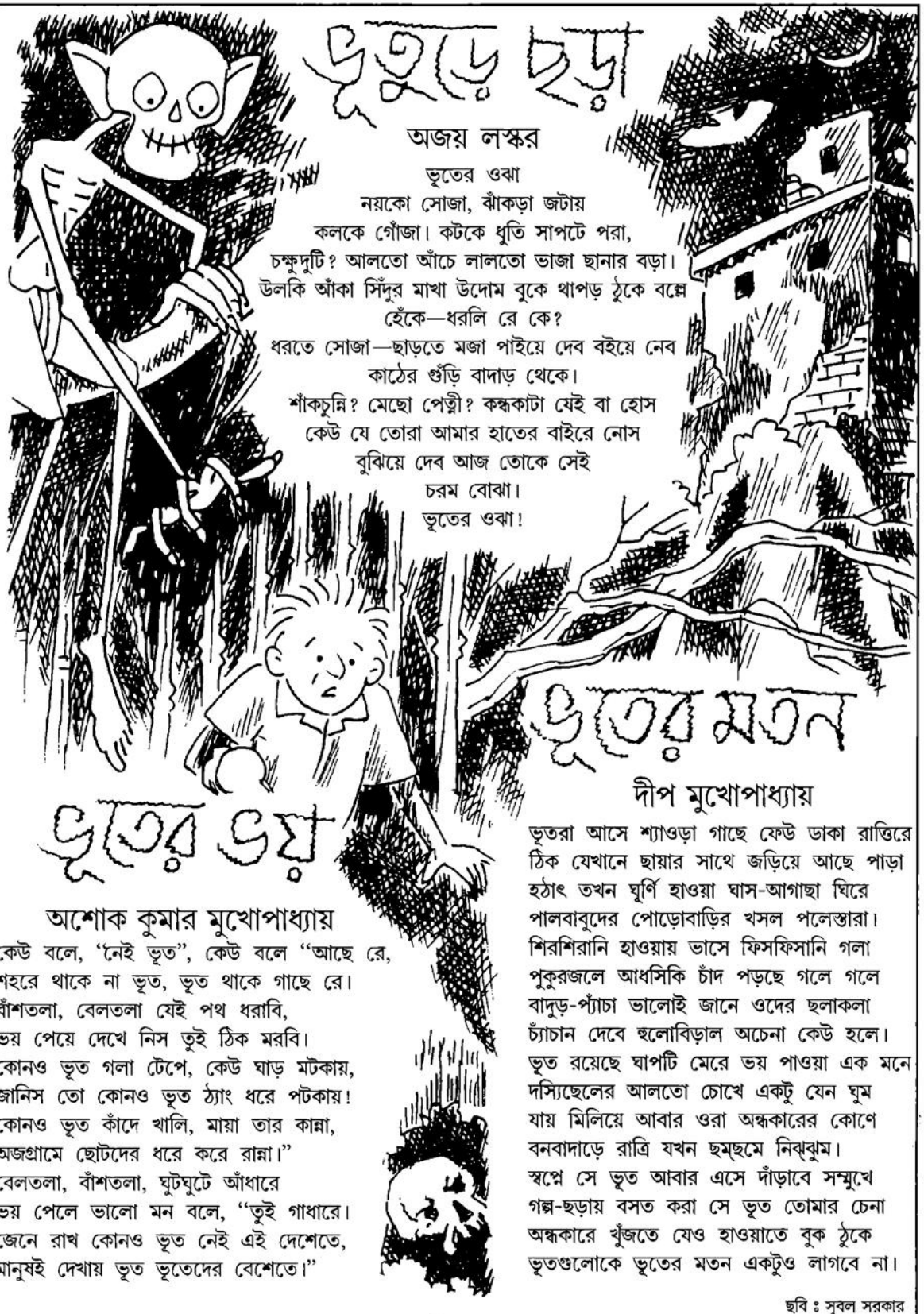

ভূতুড়ে চড়া

অজয় লস্কর

ভূতের ওঝা
নয়কো সোজা, ঝাঁকড়া জটায়
কলকে গোঁজা। কটকে ধুতি সাপটে পরা,
চক্ষুদুটি? আলতো আঁচে লালতো ভাজা ছানার বড়া।
উলকি আঁকা সিঁদুর মাখা উদোম বুকে থাপড় ঠুকে বল্লে
হেঁকে—ধরলি রে কে?
ধরতে সোজা—ছাড়তে মজা পাইয়ে দেব বইয়ে নেব
কাঠের গুঁড়ি বাদাড় থেকে।
শাঁকচুন্নি? মেছো পেত্নী? কন্ধকাটা যেই বা হোস
কেউ যে তোরা আমার হাতের বাইরে নোস
বুঝিয়ে দেব আজ তোকে সেই
চরম বোঝা।
ভূতের ওঝা!

ভূতের মতন

দীপ মুখোপাধ্যায়

ভূতরা আসে শ্যাওড়া গাছে ফেউ ডাকা রাত্তিরে
ঠিক যেখানে ছায়ার সাথে জড়িয়ে আছে পাড়া
হঠাৎ তখন ঘূর্ণি হাওয়া ঘাস-আগাছা ঘিরে
পালবাবুদের পোড়োবাড়ির খসল পলেস্তারা।
শিরশিরানি হাওয়ায় ভাসে ফিসফিসানি গলা
পুকুরজলে আধসিকি চাঁদ পড়ছে গলে গলে
বাদুড়-প্যাঁচা ভালোই জানে ওদের ছলাকলা
চ্যাঁচান দেবে হুলোবিড়াল অচেনা কেউ হলে।
ভূত রয়েছে ঘাপটি মেরে ভয় পাওয়া এক মনে
দস্যিছেলের আলতো চোখে একটু যেন ঘুম
যায় মিলিয়ে আবার ওরা অন্ধকারের কোণে
বনবাদাড়ে রাত্রি যখন ছমছমে নিঝ্‌ঝুম।
স্বপ্নে সে ভূত আবার এসে দাঁড়াবে সম্মুখে
গল্প-ছড়ায় বসত করা সে ভূত তোমার চেনা
অন্ধকারে খুঁজতে যেও হাওয়াতে বুক ঠুকে
ভূতগুলোকে ভূতের মতন একটুও লাগবে না।

ভূতের ভয়

অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

কেউ বলে, 'নেই ভূত", কেউ বলে "আছে রে,
শহরে থাকে না ভূত, ভূত থাকে গাছে রে।
বাঁশতলা, বেলতলা যেই পথ ধরাবি,
ভয় পেয়ে দেখে নিস তুই ঠিক মরবি।
কোনও ভূত গলা টেপে, কেউ ঘাড় মটকায়,
জানিস তো কোনও ভূত ঠ্যাং ধরে পটকায়!
কোনও ভূত কাঁদে খালি, মায়া তার কান্না,
অজগ্রামে ছোটদের ধরে করে রান্না।"
বেলতলা, বাঁশতলা, ঘুটঘুটে আঁধারে
ভয় পেলে ভালো মন বলে, "তুই গাধারে।
জেনে রাখ কোনও ভূত নেই এই দেশেতে,
মানুষই দেখায় ভূত ভূতেদের বেশেতে।"

ছবি ঃ সুবল সরকার

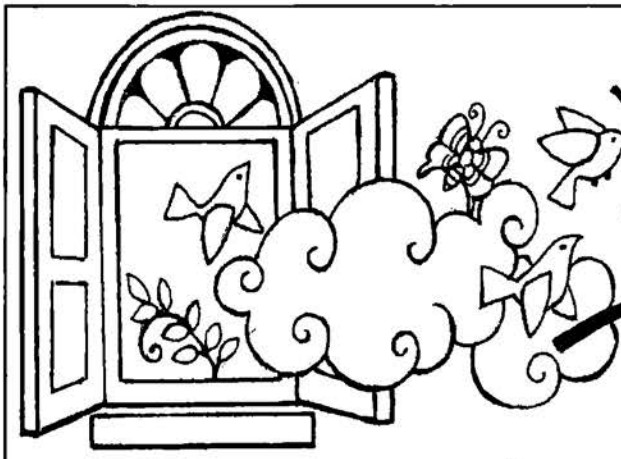

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

[অধ্যাপক ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

প্রশ্ন ঃ *আমি শুকতারা তথা মনের জানলার একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনার চিঠির উত্তরে যে সব পথ-নির্দেশ থাকে তা আমাদের যথেষ্ট উপকারে আসে। আমার সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে। আমার প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়ার ইচ্ছে আছে। আমার জানা দরকার প্রত্নতত্ত্ব পড়তে হলে কী কী বিষয় নিয়ে পড়তে হবে? এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা কোথায় কোথায় আছে? প্রত্নতত্ত্ব পড়তে হলে প্রাচীন ইতিহাস, আর্কিওলোজি, মিউজিওলোজি এই সব বিষয়ের উপর জোর দিতে হয় কি? এছাড়া আমার আর একটি বিষয় জানা দরকার, প্রত্নতত্ত্ব পড়তে হলে সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে কি? আমি আর্টসের বিষয়ে যতটা টান অনুভব করি, সায়েন্সের বিষয় ততটা আমাকে টানে না। আমি এখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমায় দয়া করে জানাবেন আমি কীভাবে কোন বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাবো। অর্থাৎ সায়েন্স পড়তে হবে না আর্টস পড়তে হবে। তারপর কি ইতিহাসে অনার্স পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব পড়ব? এ নিয়ে আমি খুব বিভ্রান্তিতে আছি। আমার খুব মানসিক অস্থিরতা হচ্ছে। দয়া করে উত্তর দিয়ে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।*

ইতি—

শ্রীতমা মাইতি,

কাঁটাপুকুর ক্ষীরাই, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। তোমার এখন থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে কী হবে এ নিয়ে সদর্থক ভাবনা আমাকে প্রীত করেছে। তুমি লিখেছ তুমি এখন ক্লাস সেভেনে পড়। এখন থেকে ভবিষ্যতে কী বিষয় নিয়ে পড়বে, কী হবে, ভাবনা থাকা ভালো। কিন্তু এখন তো তোমার সর্বশক্তি দিয়ে একাগ্রচিত্তে মাধ্যমিকে ভালো ফল করার জন্য পড়াশুনা করে যেতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। আর্টসের বিষয় তোমাকে বেশি টানে—এটা ভালো, এটা হতেই পারে। সবার সব দিকে সমান টান থাকে না এটাই মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের স্বাভাবিক গতি—তোমাকে যেমন আর্টসের বিষয় বেশি টানে, অনেকের আবার সায়েন্সের বিষয় বেশি টানে। অর্থাৎ তোমার মধ্যে ইতিহাস ও অন্যান্য আর্টসের বিষয়ে জানার আগ্রহ ও ব্যুৎপত্তি লাভের ক্ষমতা (Aptitude) বেশি। এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ ক্লাস সেভেনে পড়তে পড়তেই তোমার নিজের সম্পর্কে নিজের আগ্রহ ও ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হওয়া বেশ আশাপ্রদ। সাধারণত মাধ্যমিকের পর বা মাধ্যমিক স্তরে ঠিক করতে হয়, কে কোন শাখা নিয়ে পড়বে। মোটের উপর তুমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়বে—এবং তাতে তুমি সফল হবে এটা ধরে নিলেও, মাধ্যমিক স্তরে সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়বে, যাতে মাধ্যমিকের ফল তোমাকে সকলের মধ্যে একটা বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমার বিশ্বাস তুমি সে-রকম ফল করতে পারবে।

এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই। আর্কিওলোজি নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়তে হলে, স্নাতক স্তরে সাম্মানিক পর্যায়ের (Hons) ইতিহাস নিয়ে ভালো ফল করতে হবে—এ ছাড়া ভূগোল বা ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়েও প্রত্নতত্ত্বে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়া যায়। তোমার তো ইতিহাসে যথেষ্ট আগ্রহ আছে—কাজেই তুমি ইতিহাস (সাম্মানিক) বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে সংস্কৃত, সাধারণ বিষয়ের একটি রাখলে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়তে সুবিধা হবে। কিংবা ইতিহাসে Hons নিয়ে Pass-এ ভূগোল রেখেও স্নাতক স্তরে পড়তে পার।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত মাধ্যমিকের পরে নেওয়াই ভালো। তোমার উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি। ভালো থাক।

—

দীনবন্ধু আর বাদার জঙ্গলে যায় না

শিশির বিশ্বাস

বাদার জঙ্গলে আলো তখন মরে আসতে শুরু করেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য গাঙের জলে ডুব দেবে একটু পরেই। আলো তার পরেও কিছুক্ষণ থাকবে অবশ্য। কিন্তু দীনবন্ধুরও এখনও অনেক কাজ বাকি। ফি হপ্তায় রবিবার সাতখালির হাট। দীনবন্ধুর কাজ তার আগের দিন। সাতখালির হাট এদিকে সব চাইতে জমজমাট। অনেক দূর থেকে মানুষ আসে কেনাকাটা করতে। হাটের ব্যাপারীরা সপ্তাভর এই দিনটির মুখ চেয়ে থাকে। সওদার মালপত্র জোগাড় করে। সওদার সন্ধানে হাটের আগের দিন দীনবন্ধুও পাড়ি জমায় বাদার জঙ্গলে। সাতখালির হাটে তার যে জিনিসের কারবার, সে বস্তু বেশি আগে জোগাড় করে রাখা যায় না। শনিবার দুপুরের আগেই তাই রওনা হয়ে পড়তে হয়। বাদার জঙ্গলে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা কম নয়। মাল জোগাড় করে পরের দিন দুপুরের আগেই পৌঁছে যায় হাটে। তারপর মাল বেচে ট্যাঁকে টাকার গেঁজে নিয়ে ঘরে।

আগে এই কারবার এদিকে আরও কয়েকজন করত। কিন্তু বাবা মাধব বাউলে তখন এই কাজে নামতে দেয়নি ওকে। বাদায় বাউলের কাজ করে দিন চলত তার। ছেলেকেও হাতে ধরে শিখিয়েছিল। কিন্তু কাজটা দীনবন্ধুর কখনই পছন্দ হয়নি। বরং ঝুঁকি থাকলেও এই লাইনে খাটুনি কম। মাত্র একদিনের মেহনতে দিব্যি সারা সপ্তাহ চলে যায়। তখন কড়াকড়িও বেশি ছিল না। তাই ইচ্ছেটা ভিতরে ছিলই। তারপরেই বাবার সেই ভয়ানক পরিণতি! সবাই বলত, গুণী মানুষ ছিল মাধব বাউলে। সঙ্গে থাকলে জেলে বা মউলে কারও আর ভাবনা থাকত না। সেই মানুষ সেবার জঙ্গলে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। লাশটাও পাওয়া যায়নি।

তবে দীনবন্ধু তারপর আর দেরি করেনি। পেটের তাগিদে নেমে পড়েছিল এই কাজে। গোড়ার দিকে দু'একজনকে সঙ্গে নিত। তাতে কাজে সুবিধা হত। কিন্তু এখন দিনকাল পালটেছে। পুলিশ, বনদপ্তরের বাবুদের নজর এখন অনেক কড়া। ভয়ে অনেকেই ভিড়ে পড়েছে অন্য কাজে। তবে দীনবন্ধু পরোয়া করেনি। কিন্তু সেবার কিছু গোলমাল হয়ে গেল। শনিবার যথাসময়ে বেরিয়ে তখনও জঙ্গলে পৌঁছোতে পারেনি। পড়ে গেল বনদপ্তরের পেট্রোল বোটের সামনে। সঙ্গী ছিল গোকুল। ছেলে-মানুষ। বাবুদের চোখা-চোখা প্রশ্নের জবাব দিতে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হবার জোগাড়। অনেক কষ্টে সেদিন সামাল দিতে হয়েছিল দীনবন্ধুকে। সেই থেকে সঙ্গে কাউকে আর নেয় না।

বাবার কথা মেনে চলতে পারেনি দীনবন্ধু। সেজন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয় কখনো। তবু ছাড়তে পারেনি এই কাজ। বাদায় বাউলের কাজে অনেক পরিশ্রম। মাছ ধরতে, নয়তো মধু কিংবা কাঠ কাটতে যারা জঙ্গলে যায়, তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দায় বাউলের। দিনের পর দিন জঙ্গলে কাটাতে হয়ে। তার চাইতে এ অনেক সুবিধের। ফি হপ্তায় মাত্র একদিন বাদায় ঢুঁ মারলে নগদ যা উপায় হয়, মোটামুটি চলে যায়।

সাধারণত ফি শনিবার দুপুরের মধ্যেই বের হয়ে পড়ে দীনবন্ধু। বাদার জঙ্গলে ঢুকে আসল যা কাজ, তা

সেদিনই সেরে রাখতে হয়। পরের দিন রবিবার দুপুরের মধ্যেই মাল নিয়ে হাজির হতে হয় হাটে। তাই সেদিন সময় বেশি মেলে না। তবু যে আজ বের হতে দেরি হয়ে গেল, তা অন্য কারণে। দুপুরে তৈরি হয়ে বেরোতে যাবে, খবর এল, বনদপ্তরের বাবুরা হঠাৎ টহলে বেরিয়েছেন। অন্য দিনের মতো মামুলি টহল নয়। একেবারে পুলিশ নিয়ে। একসঙ্গে গোটাকয়েক বোট। অন্য সময় হলে আজ আর বেরোত না দীনবন্ধু। দিনকাল ভালো নয়। ধরা পড়লে শ্রীঘরের ঘানি বাঁধা। কিন্তু অন্য এক গেরোয় ফেঁসে রয়েছে। হাটের মহাজন নরহরি ঘোষের কুটুম এসেছে কলকাতা থেকে। কালকের দিনটা থেকে পরশুই ফিরে যাবে। বাদার মহাজন মানুষ নরহরি ঘোষের সাধ হয়েছে, তাদের একদিন ভালোমন্দ ভোজ খাওয়াবে। অতএব তলব হয়েছে দীনবন্ধুর। খবরটা কানে আসতেই দীনবন্ধু তাই ধাওয়া করেছিল মহাজন নরহরি ঘোষের গদিতে। কিন্তু লাভ হয়নি। দীনবন্ধুর আরজি শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'বাজে বকিসিনি বাপু। তোকে তো অনেক দিন ধরে দেখছি। পুলিশ, বন-পার্টির ভয়ে কোন শনিবার তুই বাদায় যাওয়া বন্ধ করেছিস?'

কথাটা একেবারেই সত্যি নয়। আগে না হলেও, ইদানীং কড়াকড়ি বেশি রকম বাড়তে এক-আধ দিন বন্ধ রাখতেই হয়। কিন্তু মহাজনের ওই কথাতেই মালুম পেয়েছে, পেট্রোল বোটের কারণে আজ আর চিড়ে ভিজবে না। কলকাতার কুটুম বলে কথা। মাল আজ তার চাই। বাদার বাউলে বনের বাঘের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু গদির মহাজনকে খাতির না করে উপায় কী? অগত্যা বেরোতেই হয়েছে। তবে তার আগে কিছু খোঁজখবর করতে হয়েছে। সেই কারণে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। তার উপর পেট্রোল বোটের নজর এড়াতে অনেকটা ঘুরপথে আসতে হয়েছে। পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে কপালের ভাঁজ ক্রমশ ঘন হচ্ছিল দীনবন্ধুর। ওই সময় সামনে একটা ফোড়ন খাল পড়তে অভিজ্ঞ চোখে মেপে নিয়ে সেই দিকে নৌকো ঘোরাল।

খালের দু'দিকে ঘন জঙ্গল। ভিতরে ঢুকতেই আধো অন্ধকারে দু'পাশের জঙ্গল ক্রমশ থমথমে। একটা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। নিস্তব্ধ ঝিমঝিম করা জঙ্গল। সামনেই এক বাঁকের মুখে ধানিঘাসে ভরতি প্রশস্ত এক চর। সেদিকে চোখ পড়তেই মরে আসা মনটা ফের চাঙ্গা হয়ে উঠল। লকলকে ধানিঘাসের এই জঙ্গলে এই সময় হরিণের দেখা মেলে। নদীর ধারে নরম মাটিতে টাটকা পায়ের দাগও রয়েছে। সন্দেহ নেই, খানিক আগে ধানিঘাস দিয়ে রাতের খাওয়া সারতে একপাল হরিণ খালের ওপার থেকে এদিকের জঙ্গলে এসে উঠেছে। মানুষের সাড়া পেয়ে সরে পড়লেও আশেপাশেই রয়েছে প্রাণীগুলো। নিরাপদ বুঝলেই ফের চলে আসবে। হাতের কাজগুলো তার আগে ঠিকমতো সেরে ফেলতে পারলে ফাঁদে পড়বেই।

নামার আগে চারপাশে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিল দীনবন্ধু। না, যতদূর চোখ যায় বড় শেয়াল অর্থাৎ বাঘের পায়ের খোঁচ নেই। না থাকারই কথা। অল্প আগে এতগুলো হরিণ যে জঙ্গলে উঠেছে, সেখানে বাদার দুশমন বড় শেয়াল থাকার কথা নয়।

ফাঁদ পেতে হরিণ ধরার এই কাজে দীনবন্ধুর সরঞ্জাম এক গোছা নাইলনের দড়ি। পাছে পেট্রোল বোটের বাবুদের সন্দেহ হয়, সাবধানী দীনবন্ধু সেটাও নৌকোয় রাখে না। একটা ইট বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় নৌকোর তলায়। বনদপ্তরের অভিজ্ঞ বাবুরাও ধরতে পারে না। দড়ি ছাড়া আর দরকার ছিপছিপে গরান গাছের লগি। আসবার পথে তার গোটাকয়েক কেটে এনেছে। দীনবন্ধু দড়ির গোছা বের করে চটপট সেগুলো লগির মাথায় বেঁধে ফেলল। দড়ির অন্য মাথায় একটা করে ফাঁস। খুব সহজ উপায়ে তৈরি এই ফাঁদ হরিণ ধরার জন্য একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। গোটাকয়েক ফাঁদ তৈরি হতেই দীনবন্ধু সেগুলো নিয়ে নেমে পড়ল। ঘাসের জঙ্গলের স্থানে স্থানে লগিগুলো দ্রুত পুঁতে দিয়ে হাতের কায়দায় দড়ির অন্য প্রান্তে ফাঁস তৈরি করতে তেমন সময় লাগল না। কিছু কচি ঘাস ফাঁসের ভিতর ছড়িয়ে দিল। ঘাসে মুখ দিলেই গরান লগি ছিটকে উঠে ফাঁস জড়িয়ে যাবে হরিণের গলায়। বেচারা যতই টানাটানি করবে ততই চেপে বসবে ফাঁস। বেশির ভাগই দম বন্ধ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যায়। অতি সহজ এই কায়দার একটাই সমস্যা। এক জায়গায় যত ফাঁদই পাতা হোক, একটার বেশি হরিণ ধরা পড়ে না। একটা ফাঁদে আটকালেই বাকিরা ছুটে পালিয়ে যায়। তাই এক জায়গায় নয়, দূরে দূরে দু'তিনটে জঙ্গলে ফাঁদ পাততে হয়। কিন্তু আজ হাতে তেমন সময় নেই। দ্রুত কাজ শেষ করে দীনবন্ধু এরপর নৌকোয় ফেরার পথ ধরেছে, নিস্তব্ধ জঙ্গলে হঠাৎ হাততালির শব্দ। পর পর তিনবার।

অন্য কেউ হলে পাখির ডাক বলেই ভাবত। নিস্তব্ধ জঙ্গলে অনেক সময় কোনও কোনও পাখির ডাককেও এমন হাততালির শব্দের মতো মনে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ দীনবন্ধু সেই শব্দে প্রায় কেঁপে উঠল। পাখির ডাক নয়, কোনও মানুষের তালি দেওয়ার শব্দ। কাউকে হুঁশিয়ার হবার সঙ্কেত।

হাতে দা ছিলই। শক্ত করে ধরে চারপাশে তাকাল। কিন্তু তেমন কিছুই নজরে পড়ল না। এই অবেলায় নির্জন বাদার অরণ্যে ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ নয়। কিন্তু আওয়াজটা আর শোনা গেল না। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ফের চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ নজরে পড়ল বড় একটা কালাচ সাপ ঘাসের ফাঁকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। ভাগ্যিস, অল্প আগে ওই ব্যাপারের পর সাবধানে পা ফেলছিল। নইলে দেখতে হত না। বাদার গ্রামাঞ্চলে এই কালাচ সাপের উপদ্রব ভয়ানক। প্রতি বছর বহু মানুষ মারা যায়। বাবার কাছেই শুনেছে, কালাচ ছোবল দিয়ে তেমন বিষ ঢালতে পারলে বাঁচে না কেউ। তবে বিষের পরিমাণ কম থাকলে মৃত্যু এড়ানো যায়।

বাবা নিজেই সেসব ওষুধ জানত। কত মানুষকে বাঁচিয়েছে। দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষ আসত। বিষ নামানোর কাজে বাবা ওকেও সঙ্গে নিত। তাই চিকিৎসার নিয়মকানুন ভালোই জানা আছে। কিন্তু ওষুধটা আর জানা হয়দি। বাবা বলেনি কখনও। অবশ্য সেও জিজ্ঞাসা করেনি। সাপের বিষ নামিয়ে তখন ভালোই রোজগার হত বাবার।

নৌকোয় ফিরে খানিক দূরে খালের মাঝখানে নৌকো বাঁধল দীনবন্ধু। আপাতত কোনও কাজ নেই। অন্ধকার ইতিমধ্যে আরও ঘন হয়েছে। দূরের কিছু আর নজরে পড়ছে না। সেই শব্দটা এরপর আর শোনা যায়নি। হয়তো মনেরই ভুল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দীনবন্ধু ছইয়ের ভিতর একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। ফাঁদে হরিণ পড়লে দাপাদাপির শব্দ পাওয়া যায়। রাত বেশি না হলে জঙ্গলে নেমে নৌকোয় তুলে নেবে সেই মতলব। কিন্তু একটু একটু করে সময় পার হয়ে গেল, তেমন কোনও আওয়াজ ওর কানে এল না।

এসব ব্যাপারে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। এমন হবার কথা নয়। এই সন্ধের মুখে ধানিঘাসের জঙ্গলে হরিণ থাকলে খুব সহজেই ফাঁদে পড়ে যায়। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সন্দেহ নেই। সন্দেহ যে অমূলক নয়, খানিক বাদেই টের পেল দীনবন্ধু। খানিক আগে হাততালির সেই আওয়াজটা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ পরিষ্কার মানুষের গলার আওয়াজে চমকে উঠল, 'ও মাঝি।'

তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলো দীনবন্ধু। চারপাশে ঘন অন্ধকার হলেও জলের কাছে সামান্য ফিকে আলো থাকায় দেখতে ভুল হল না। অদূরে খালের ধারে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে শতচ্ছিন্ন একটা ফুলহাতা চেক কাটা জামা। খাটো ধুতি। মাথায় মাফলারের মতো করে তেলচিটে একটা গামছা প্যাঁচানো। সেগুলোও শতচ্ছিন্ন অবস্থা। দীনবন্ধু বাইরে আসতেই লোকটা হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

দীনবন্ধু বাদাবন হাঁটকে বেড়ানো মানুষ। তবু ব্যাপার দেখে গোড়ায় ঘাবড়ে গেলেও সামলে নিতে সময় লাগল না। গলা সামান্য ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'কে তুমি? এই রাতে এখানে কীভাবে এলে?'

'সে অনেক কথা বাবা।' ঘড়ঘড়ে গলায় ওদিক থেকে জবাব এল, 'নৌকোয় তুলে নিয়ে আগে বাঁচাও আমাকে। প্রাণ হাতে নিয়ে আজ কয়েক দিন হল পড়ে আছি এই জঙ্গলে।'

দীনবন্ধু এরপর আর দেরি করল না। নৌকো এগিয়ে নিয়ে তাকে তুলে নিল। নৌকায় উঠে বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে লোকটা বলল, 'বেঁচে থাক বাবা। বড় উপকার করলে।'

মানুষটার উপর ততক্ষণে যথাসম্ভব চোখ বুলিয়ে নিয়েছে দীনবন্ধু। যথেষ্টই বয়স মানুষটার। খড়ি ওঠা রোগা শরীর। মাথায় গামছা ফেলা থাকায় মুখটা তেমন নজর পড়ল না। লোকটা নৌকোয় উঠে ধপ করে বসে পড়েছে। বোঝাই যায়, ক'দিন খাওয়া হয়নি। পরিশ্রান্ত। তবু সামান্য কড়া গলায় বলল, 'সে তো হল, কিন্তু আমার যে সর্বনাশ করে দিলে। ফাঁদে কেন যে এখনও শিকার পড়েনি, তা বুঝতে পারছি এবার। কাল মহাজনকে যে কী বলে বোঝাব, তা ভগবানই জানেন।'

ওদিকে কোনও সাড়া নেই। দীনবন্ধু বলল, 'খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। সঙ্গে চিড়ে-বাতসা আছে, দেব?'

'থাক বাবা। এই যে বললে, তাই অনেক। ক'দিন পেটে কিছু পড়েনি। নাড়ি শুকিয়ে ঝামা হয়ে রয়েছে। ঢুকবে না। বরং থাকলে জল দাও একটু।'

দীনবন্ধু কলসি থেকে জল ঢেলে এগিয়ে দিল। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে লোকটা প্রায় হামলে পড়ল তার উপর। মুখে নিয়ে ঢকঢক করে প্রায় এক নিঃশ্বাসে গ্লাস খালি করে নামিয়ে রাখতে যাবে, দীনবন্ধুর নজরে পড়ল জল খেতে গিয়ে লোকটার জামার অনেকটাই ভিজে গেছে। ও বলল, 'জল আর দেব?'

'না, থাক।' গ্লাস নামিয়ে লোকটা তৃপ্তিতে একটা নিঃশ্বাস নিল, 'ক'দিন পরে জলটা মুখে পড়তে বড় তৃপ্তি পেলাম। বেঁচে থাকো বাবা।'

ভিতরের ক্ষোভ তখনও পড়েনি দীনবন্ধুর। কিন্তু লোকটার ওই কথায় হঠাৎ পুরোনো দিনের কিছু কথা মনে পড়ে যেতে ভিতরটা হু-হু করে উঠল। লোকটা কিন্তু থামল না। তৃপ্তিতে একটা ঢেকুর তুলে বলল, 'ঠিক কথা বাবা। তোমার বড্ড লোকসান করে দিলাম আজ। আমি এখানে না এসে পড়লে শিকার এতক্ষণ একটা পেয়ে যেতে। মহাজনের কাছে মান বাঁচত।'

'ও কথা থাক।' দীনবন্ধু বলল, 'কিন্তু এই জঙ্গলে একা এভাবে কী করে এলে?'

অন্ধকারে অল্প হাসল লোকটা, 'তুমি যেভাবে এসেছ, ঠিক সেই ভাবেই এসেছিলাম বাবা। ফাঁদ পেতে হরিণ শিকারে।'

'তারপর?' উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠ দীনবন্ধুর।

'সে দিন কয়েক আগের কথা।' অল্প থেমে বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'তোমার মতো একাই এসেছিলাম এই জঙ্গলে। পিটেল (পেট্রোল) বোট সেদিন বেশিই ছিল পাহারায়। পড়েও গিয়েছিলাম তাদের সামনে। কিন্তু বোঝাতে খুব বেগ পেতে হয়নি। সন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল। মনে মনে হেসে নিয়েছিলাম খুব। তখন কী আর ভেবেছিলাম, পিটেল বোটের লোকগুলো আড়াল থেকে নজর রাখছে। তারপর এখানে এসে তুমি যেখানে নৌকো ভিড়িয়েছ, আমিও সেখানে নৌকো লাগিয়েছিলাম। তারপর নেমে জঙ্গলের ভিতর ফাঁদ পাতা শুরু করেছি, দূরে ভটভটির শব্দ। একটু পরে বুঝলাম, শব্দটা এদিকেই আসছে। বুঝতে তখন বাকি নেই ব্যাপারটা। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য আড়াল থেকে তাকালাম। ততক্ষণে সেই পিটেল বোট আমার নৌকোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছি, ওদিক থেকে কড়া

গলা ভেসে এল, 'বাঁচতে চাও তো এসে ধরা দাও শিগগির।'

'কিন্তু বুঝতেই পারছ বাবা, ধরা দিলেই জেলের ঘানি। পুলিশের হাতে হেনস্থা। তাই যেমন ছিলাম, তেমনই দাঁড়িয়ে রইলাম। পিটেল বোটের বাবুরা বেশি দেরি করল না। আরও বারকয়েক হুঁশিয়ারি দিয়ে নৌকোটা নিয়ে চলে গেল। সেই থেকে আটকে আছি এই জঙ্গলে।'

'এর মধ্যে কোনও নৌকো এদিকে আসেনি?' দীনবন্ধুর গলা তখন আতঙ্কে প্রায় কাঠ। এতবার হরিণ শিকারে জঙ্গলে এসেছে, এমন সম্ভাবনার কথা ভাবেনি।

'না আসেনি। এই প্রথম কারো দেখা পেলাম। বেঁচে থাকো বাবা।'

লোকটার কথায় চোখে হঠাৎ জল এসে গেল দীনবন্ধুর। ও বলল, 'অমন বলবেন না। আপনি একটা উপকারও করেছেন আমার। তখন হঠাৎ আওয়াজ না দিলে হয়তো এক কালাচ সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলতাম। ঘাসের জঙ্গলে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে ছিল।'

'সে কী!' উদ্‌বিগ্ন হয়ে লোকটা বলল, 'কামড়ায়নি তো?'

'না কামড়ায়নি। বাবা থাকলে পরোয়া করতাম না। জানেন, বাবা সাপের বিষের ওষুধ জানত। কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'সাপের বিষের—!' থেমে গিয়ে সামান্য ইতস্তত করে লোকটা বলল, 'তোমায় বলি বাবা, সাপের বিষের ওষুধ আমিও জানি। কালাচ সাপ ছোবল দিয়ে বিষ যদি সেভাবে না ঢালতে পারে, তো ওষুধটা খুব কাজ দেয়। তবে কিছু নিয়ম আছে।'

দীনবন্ধুর সেসব জানা। বাবাকে দেখেছে। ও বলল, 'সেসব আমিও জানি। কিন্তু ওষুধটাই বাবা বলে যায়নি।'

'ও দেওয়া যায় না বাবা।' লোকটা হাসল অল্প। 'মৃত্যুশয্যা ছাড়া ও ওষুধের কথা কাউকে বলা যায় না। গুরুর বারণ।'

'বাবাও তাই বলতেন।' লোকটা থামতেই দীনবন্ধু বলল, 'একটা কথা বলি, গুণী মানুষ আপনি। তবু এই বেআইনি কাজ কেন করতেন?'

'করতাম না তো বাবা। যারা এসব করত তাদেরও মানা করেছি অনেক। তবু নিজেরই একদিন মতিভ্রম হল। সেও গঞ্জের এক মহাজনের তাগিদে। হরিণের মাংস খাওয়ার শখ হয়েছিল তার। হঠাৎ কিছু টাকার দরকারে তার কাছে গিয়েছিলাম। তাই না শুনে উপায় ছিল না। কিন্তু উপরওয়ালা সইবেন কেন। শাস্তি সাথে সাথেই দিয়েছেন। একটা কথা বলি বাবা। এ কাজ ছেড়ে দাও তুমি।'

অন্য সময় হলে দীনবন্ধু পাঁচ কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু আজ গুম হয়ে রইল। বেশ জানে, লোকটার এই কথা রাখা সম্ভব নয়। শুধু বাউলের কাজে সংসার চলে না।

কথায় কথায় ইতিমধ্যে রাত বেড়েছে। নিস্তব্ধ বাদার জঙ্গলে শুধু ভাটার টানের কলকল শব্দ। টপটপ করে হিম পড়তে শুরু করেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে হিম পড়াও বাড়তে থাকবে। দীনবন্ধু বলল, 'হিম পড়ছে। ছইয়ের ভিতরে এসো।'

'ওই দ্যাখো। খেয়ালই করিনি!' লোকটা হঠাৎ যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'যাও বাবা। ভিতরে যাও। আর বাইরে থাকা ঠিক হবে না। ঠান্ডা লেগে অসুখ হতে পারে।'

কথা মিথ্যে নয়। বাদা-গ্রামের মানুষ হলেও রাতের এই হিম একেবারেই সহ্য হয় না দীনবন্ধুর। ও ভিতরে গেলেও লোকটা কিন্তু বাইরেই বসে রইল। দীনবন্ধু বলল, 'ভিতরে কিন্তু জায়গা আছে। দুজনের বেশ হয়ে যাবে।'

সেই কথায় অন্য পক্ষ অন্ধকারে অস্ফুট হেসে বলল, 'ভেবো না বাবা। রাতের পর রাত জঙ্গলে কাটিয়ে এসবে এখন আর কিছু হয় না আমার। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাঠ হয়ে গেছে শরীর। ঘুমটাও গেছে। কতদিন যে চোখে ঘুম নেই, ভুলেই গেছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো বরং। আমি জেগে আছি। ঘুম যদি আসে, শুয়ে পড়ব।'

দীনবন্ধু কথা বড়াল না। সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল ওর। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, হুঁশ নেই। দীনবন্ধুর সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। বাইরে কোথাও চমৎকার সুরে একটা পাখি ডাকছে। বাদার এই গভীর জঙ্গলে পাখির ডাক কমই শোনা যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ও। তখনই মনে পড়ল, গত রাতের সেই লোকটার কথা।

চোখ কচলে চারপাশে তাকাল। কিন্তু মানুষটাকে নৌকোয় দেখতে পেল না। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল, ছইয়ের এক কোণে শতচ্ছিন্ন এক চেক শার্টের দু'দিকে গিঁট মেরে বাঁধা একটা ছোটমতো পুঁটলি। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ও খুলে ফেলল সেটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরটা মুহূর্তে কেঁপে উঠল। খড়মড় শব্দে গোটাকয়েক শুকনো ভাঙাচোরা হাড় আর একটা নর-করোটি গড়িয়ে পড়ল ভিতর থেকে। সেই সঙ্গে খুব চেনা দুটো লতার শেকড়সুদ্ধু টাটকা ডাঁটা।

সেই হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠল দীনবন্ধুর ভিতরটা। বাঘে খাওয়া ভাঙাচোরা হাড়গুলোর ভিতর বাঁ হাতের ডানার হাড়ে কালো সুতোয় বাঁধা একটা তাবিজ। গত রাতে অন্ধকারে বাবার শতচ্ছিন্ন চেক শার্ট চিনতে না পারলেও তাবিজটা চিনতে ভুল হল না দীনবন্ধুর।

সে প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। সবে বিয়ে করেছে দীনবন্ধু। নতুন একটা ঘর তোলার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। বাবার হাতে তেমন টাকা ছিল না। কিছু ধারের জন্য গিয়েছিল হাটে এক মহাজনের গদিতে। আর ফিরে আসেনি। শুধু জানতে পেরেছিল, হাটের দুপুরে বাবা নৌকো নিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল।

দীনবন্ধু এখন আর জঙ্গলে যায় না। ধারদেনা করে গ্রামে ছোট এক দোকান দিয়েছে। তাতেই চালিয়ে নেয়। সাপের বিষের চিকিৎসা করেও কিছু উপায় হয়।

—

ছবি ঃ দিলীপ দাস

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

মোরা খেলব মোরা ছুটব !

ব্রতচারীর স্রষ্টা গুরুসদয় দত্ত অনেকদিন আগেই একথা বলেছিলেন। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা এর যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যাঁরা বেশিরভাগ সময় বসে কাটান তাঁদের মধ্যে অনেক অস্বাভাবিকতা ধীরে ধীরে তৈরি হয়। ষাট বছর-এর কাছাকাছি বয়স হলেই এগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ধরনের অস্বাভাবিকতাগুলি প্রতিদিনের সাধারণ কাজকর্ম যেমন চান করা, খাওয়া-দাওয়া করা, জামাকাপড় পরা, বিছানা ছেড়ে ওঠা, হাঁটাচলা সবকিছুই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ১৯ ফেব্রুয়ারিতে ফিজিক্যাল অ্যাকটিভিটি অ্যান্ড হেলথ জার্নালে এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন অনেকক্ষণ ধরে টিভি দেখা, পড়া, গাড়ি চালানো, ভিডিও গেম খেলা, কম্পিউটারে কাজ এসব উপসর্গ তৈরি করে। শরীরে চর্বির সঞ্চয় বাড়ে। এজন্য একনাগাড়ে বসে না কাজ করে প্রতি ঘণ্টায় দশ মিনিট করে উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য জোরে পায়চারি করা বা হাঁটা উচিত। লিফটের বদলে সিঁড়ির ব্যবহার, দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র পড়া প্রভৃতি বসে-থাকা জনিত উপসর্গগুলি দূরে রাখতে সাহায্য করে।

ছোটদের শেখার জন্য খেলনা

খেলতে খেলতে শেখা। অথবা শিখতে শিখতে খেলা। খেলতে খেলতে শেখার এই নতুন ধারণাকে বলে জারপেট। বিজ্ঞানীরা এমনভাবে একটি জারকে তৈরি করেছেন সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি 3D প্রোজেক্টর। যার সাহায্যে শিশুদের সামনে ছোটখাটো কীটপতঙ্গ, প্রাণীদের ভার্চুয়াল ছবি ইউ. এস. বি-র মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা যাবে। জারের মধ্যে কীটপতঙ্গের নড়াচড়া দেখে খেলতে খেলতেই শিশু সেই পতঙ্গ বা কীটের বিষয়ে অনেক কিছু দেখার মধ্যেই শিখে যাবে। ছবিতে দেখানো হয়েছে একটি প্রজাপতির জীবনচক্র। তার ডিম, লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ দশা।

ওরে ভাই সজারু

সজারু নামটা উচ্চারণ করলেই কাঁটা শব্দটাও মনের মধ্যে চলে আসে। মনে হয় হিংস্র এক ছোট জীব যা কোনো প্রাণী বা মানুষকে দেখলেই কাঁটা ছুড়ে মারে। কাঁটা ছুড়ে শিকার করে খায়। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। সাধারণভাবে সজারু তৃণভোজী প্রাণী। পাতা, গাছের কচি শাখা, ছাল, কপি প্রভৃতিই তাদের খাদ্য। সজারুরা নব্বই সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ওজনে তিরিশ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। সজারুর দেহে থাকে প্রায় তিন হাজার ছোট-বড়ো শক্ত সূচালো কাঁটা। এই কাঁটার ভয়ে মাংসাশী প্রাণীরা তাকে এড়িয়ে চলে। তবে ভয় পেলে সজারু কাঁটা ছোড়ে না। প্রথমে কাঁটা দিয়ে খটখট শব্দ করে। আক্রান্ত হলেই কাঁটা ছুড়ে শত্রুকে ঘায়েল করে। এই কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র প্রাণীকেও সজারু থামিয়ে দেয়। পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

নভেম্বরের শুরুতে শীত একটু হালকা ছিল, কিন্তু ডিসেম্বর পড়তে না পড়তেই তা বেশ জাঁকিয়ে বসল। সেই হাড়-কাঁপুনি শীতের রাত্রে ঠাকুরদা মুচকুন্দপুর গ্রাম থেকে ডাক পেলেন। ঠাকুরদা ডাক্তার মানুষ। কোনো রোগীর খবর তাঁর কানে গেলে তিনি আর বসে থাকতে পারেন না। ওষুধপত্রের ব্যাগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ঠাকুরদার সাইকেলে বাঁধাই থাকে।

ঠাকুরদা গায়ে একটা শাল চাপিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ সাইকেল চালালে শরীর গরম হয়ে উঠবে ভেবে তিনি জোরে জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগলেন। রাস্তা শুনশান। সাইকেলে ডায়নামো ফিট করা লাইট রয়েছে। সেই আলোতে ঠাকুরদার সাইকেল দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল।

চওড়া রাস্তা ছেড়ে তিনি শর্টকাট করবার জন্য সরু পায়ে-চলা রাস্তা ধরলেন। বহুদিন এ পথ দিয়ে আসা হয়নি। মুচকুন্দপুর যতবার গেছেন ঘুরপথ দিয়েই গেছেন। রাস্তা জুড়ে বাবলা আর আকন্দের রাজত্ব। গাছের ডাল রাস্তায় এসে পড়ে পথটাকে আরো সরু করে তুলেছে। ঠাকুরদা গা বাঁচিয়ে সাইকেল চালাতে লাগলেন। এরকম রাস্তায় সাইকেল চালানো তাঁর বেশ অভ্যেস আছে। কিছুদূর গিয়ে ডান পাশে বাঁক নিতে যেতেই বিপত্তিটা বাধল। গায়ের ভারী শালটা ধরে কে যেন টান দিল। আর টান দিতেই তাঁর সাইকেলের গতিবেগ কমে গেল। সাইকেল দাঁড়িয়ে পড়তেই সাইকেলের আলোও নিভে গেল। তিনি অন্ধকারে ব্যাগ থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালালেন। আলোর ফোকাস খুব একটা জোরালো নয়। ব্যাটারি কমে এসেছে। টর্চের আলোয় দেখলেন শেঁয়াকুলের ছোট ছোট কাঁটায় শালটা আটকে গেছে। লম্বা শেঁয়াকুলের ডালটা এমনভাবে রাস্তার মাঝে এসে পড়েছে যে আর একটু হলেই ডালটা তাঁর মুখে লাগত। যাইহোক তিনি দ্রুত হাতে কাঁটা ছাড়ানোর কাজে নেমে পড়লেন। তবে অন্ধকারে কাঁটা ছাড়ানোর কাজটা মোটেই সহজ হল না। শালের একপ্রান্ত কাঁটামুক্ত হতেই অন্যপ্রান্ত ফের কাঁটার জালে আটকা পড়ছে। অনেকটা চোর-পুলিশ খেলার মতো। তিনি বেশ বিরক্ত হলেন। এদিকে রোগীর বাড়ির লোকজন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ঠিক সময়ে পৌঁছে চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারলে অনেক জটিল কেসেরও সুরাহা করা যায়। তাই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

ঠিক তখনই মাটি ফুঁড়ে উঠে এল লোকটা। গায়ে একটা মিশমিশে

কালো কম্বল। মাথায় উসকোখুসকো চুল। ঠাকুরদা তাকে দেখে বেশ হকচকিয়ে গেলেন। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, তা আপনি?

লোকটি বলল, ডাক্তারবাবু আমি মুচকুন্দপুর গাঁয়েরই লোক।

ডাক্তারবাবু বুঝলেন, তাঁর দেরি দেখে রোগীর বাড়ির লোক এতদূর চলে এসেছে। লোকটা অবলীলায় শেঁয়াকুলের কাঁটা থেকে শালটিকে আলাদা করল। তারপর গাছের ডালপালাগুলো অন্যপাশে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে ডাক্তারবাবুর কাছে এসে বলল, আপনার ঋণ শোধ করবার নয় ডাক্তারবাবু। এই হাড়কাঁপানো শীতের রাতে আপনি রোগীর চিকিৎসার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন দেখে অবাক হচ্ছি। আপনি মানুষ নন ডাক্তারবাবু, আপনি ভগবান।

গ্রামের দিকে কেউ বিপদে পড়লেই ডাক্তারবাবুকে ভগবান বানিয়ে দেয়। তাই ঠাকুরদা তার কাথায় কান না দিয়ে সাইকেলে উঠে পড়লেন। ভাবলেন লোকটি পেছনে পেছনে আসছে আসুক, তিনি ততক্ষণে মুচকুন্দপুরে পৌঁছে যাবেন।

রোগীর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল গতিক ভালো নয়। লোকজনদের জটলা আর ফিসফাস আওয়াজেই তিনি বুঝলেন রোগী মারা যাওয়ার পথে। একটি কম-বয়েসি ছোকরা ডাক্তারবাবুর ব্যাগ হাতে নিয়ে রোগীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ডাক্তারবাবুকে কাছে পেয়ে ঘরের লোকজন একটু আশার আলো দেখল। যদি চিকিৎসায় কিছু কাজ দেয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে বুঝলেন অল্প কিছুক্ষণ আগেই রোগী মারা গেছে। তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তারপর হ্যারিকেনের আলোটা যেই রোগীর মুখের দিকে ফেলেছেন অমনি তিনি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন!

আরে এই তো সেই লোকটা যে একটু আগেই তাঁকে শেঁয়াকুলের কাঁটা থেকে মুক্ত করল। লোকটার গায়ে এই কম্বলটাই তো তিনি এইমাত্র দেখে এলেন। এটা কী করে সম্ভব? তিনি কিছু ভেবে পেলেন না। ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লেন। এই শীতের মধ্যেও তাঁর পিঠ দিয়ে ঘামের স্রোত বইতে শুরু করল। এটা কীসের ঘাম, ভয়ের? না এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে এলেন তার জন্য? তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। শুধু মনে হতে লাগল লোকটি যেন বলছে, ডাক্তারবাবু আপনি মানুষ নন, আপনি ভগবান, না হলে এই হাড়কাঁপানো শীতের রাতে এতটা পথ...।

—

ছবি ঃ রঞ্জন দত্ত

দেব সাহিত্য কুটীরের পূজা বার্ষিকী

৪৭ বছর পরে আবার ছাপা হল

অরুণাচল

দাম ঃ ১৫০.০০ টাকা

লিখেছেন ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, জাদুসম্রাট পি. সি সরকার, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

৩৩ বছর পরে ছাপা হল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

সোনার ঝাঁপি

দাম ঃ ১০০.০০ টাকা

"ছোটবেলার দাম বোঝা যায় বড়বেলায়। সে সময় পা দুখানা ছোটে সাইকেলের আগে। রাতে শুয়ে মনে হয় কখন ভোর হবে। রোগা নদী দেখে তার ভরা চেহারা মনে আসে.....সেই সব কথা নিয়েই এ সব গল্প।"

৩৯ বছর পরে প্রকাশিত হল

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের

বাঘ ভালুকের দেশে

দাম ঃ ১০০.০০ টাকা

"বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য বনের মধ্যে লালগোলার মহারাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এই পুস্তকে। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা রূপকথার চেয়েও কম আকর্ষণীয় হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।"

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
Phone : ২৩৫০-৪২৯৪, ৪২৯৫, ৭৮৮৭
dev_sahitya@rediffmail.com

নতুন মজা

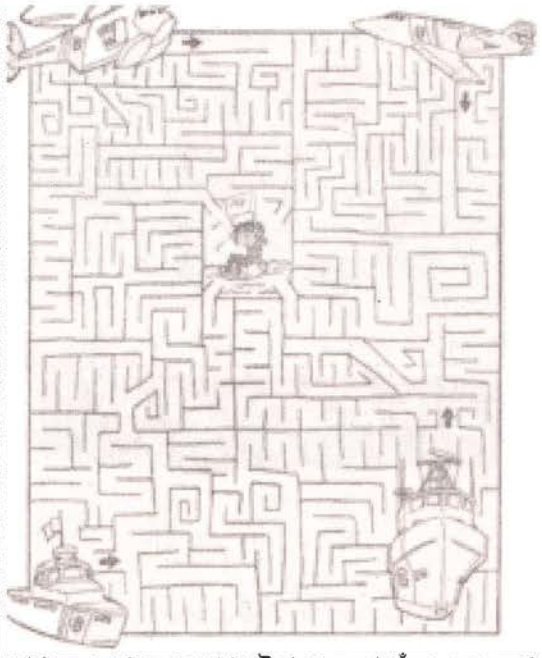

মাঝ সমুদ্র থেকে কে প্রথম উদ্ধার করলো খুঁজে বের করো

এ দুটি ছবি-ই একজন বিখ্যাত মানুষের দুটি ভিন্ন বয়সের ছবি। বলা তো কে সেই আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ?

নতুন শব্দমালা

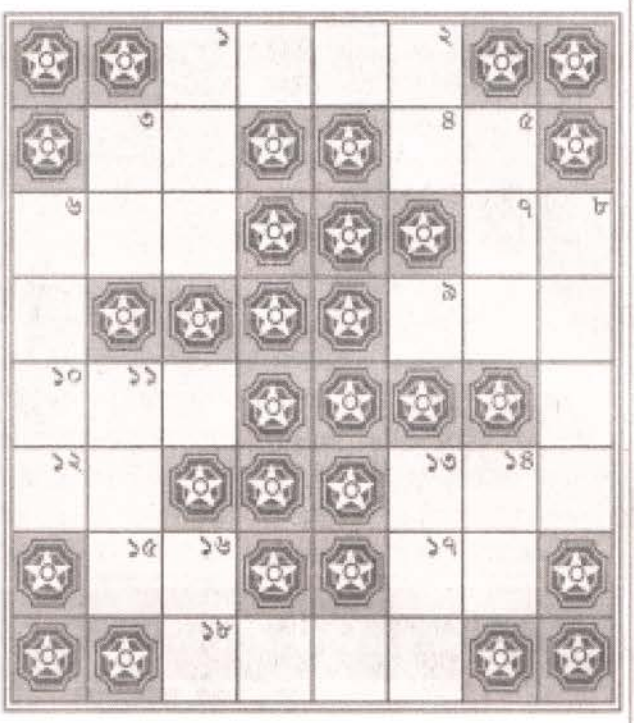

এটি তৈরি করেছেন বিভাংশু দত্ত, আরামবাগ, হুগলি

'নতুন শব্দমালা'-র উত্তরের প্রতিটি বর্ণে 'আ'/'আ'-কার যুক্ত থাকবে

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১) উঁচু পাকা বাড়ি, উপরতলার ঘর, প্রথম দুই কঙ্কণ ৩) পথ, উল্টে হেরে যাওয়া ৪) কোমর, মার্জিত করা ৬) প্রশান্ত মহাসাগরকে ছোঁওয়া বিখ্যাত খাল ও রাষ্ট্র ৭) অসমের পর্বত, প্রাচীন জাতি ৯) পৃথক ১০) যার মা নেই, মাতৃহীন ১২) থেমে যাওয়া ১৩) বারবার অনুরোধ, পাওনাদার যা করে ১৫) প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা ১৭) রাই, রাধিকা ১৮) এখানে ছাপার কাজ হয়, প্রেস।

উপর-নীচ ঃ ১) নাসাউ যে-দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ২) নামাঙ্কিত, অবতরণ করা ৩) রাজপুত নৃপতির উপাধি ৫) বাতায়ন ৬) পরিণত মস্তিষ্ক ৮) স্তূপীকৃত, রাশি রাশি ১১) হিন্দিতে 'আমাদের' ১৩) উচ্চাঙ্গ সংগীতে বোলযুক্ত রূপ ১৪) গর্ভ ১৬) কোমরে গোঁজা কাপড়ের অংশ, নিকটবর্তী হওয়া।

নতুন ধাঁধা

১। আগের দিন বা পরের দিন নয়
শ্রান্তিতে মিলবে পরিচয়।

শ্যামাপ্রসাদ দাশ
কয়াপাট/হুগলি

২। কাঁচা! অবাক হলে?
উল্টে দিলে মরুভূমি পেলে।

লক্ষ্মীশ্রী লাই
লেকটাউন/কলকাতা

৩। মাথা কাটলে বাদানুবাদ হবে
নয়তো তুমি সদা সাবধান রবে।

অভিজিৎ দাস
বেথুয়াডহরি/ নদীয়া

৪। বলো তো সম্রাট সে কে?
চাঁদ যেখানে গোপন থাকে।

দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দিগপাড়/ বাঁকুড়া

উত্তর

১   উদ্ধারকর্তা ২   পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

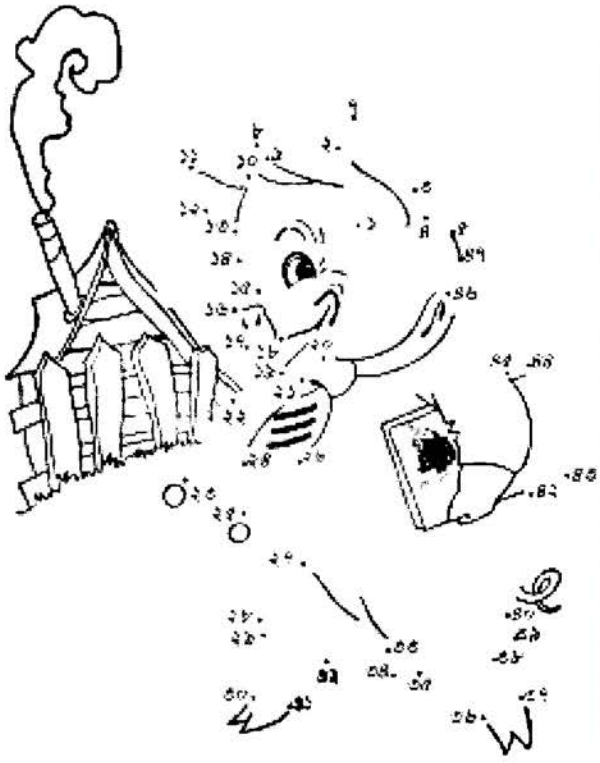

ভাদ্র সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর ঃ
১. বাদাম ২. মাদল ৩. গোপাল ৪. দাবা

শ্রাবণ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর ঃ

পাশাপাশি ঃ ১) অন্তরঙ্গতা ৫) তালেবর ৭) রকমফের ১০) ভাস্বর ১২) সরল ১৪) আপনপর ১৭) সরকার ১৯) কচুরিপানা।

উপর-নীচ ঃ ১) অন্দর ২) রহিম ৩) তাতার ৪) রব ৬) রজার ৮) কট্টর ৯) ফেরি ১১) স্বরূপ ১২) সরেস ১৩) রিপ ১৪) আরক ১৫) নম্বরি ১৬) রওনা ১৮) রশ্মি।

মজার পাতা

ডট থেকে ডট যোগ করে ছবি বানাও

হাতির ছায়ায় লুকিয়ে থাকা ৫টি জন্তুকে খুঁজে বের করো!

আষাঢ় মাসের নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।। **কলকাতা**।। অর্ণব, করাল, অঙ্কিতা, অলোক, ঝর্না, জগন্নাথ, রাধারানি, শুভম, রিমি, খোকন, বন্যা/জোকা; শুভ্রমাল্য, সৌমি, সৌরভ, শ্রেয়সী, মমতা/বেলগাছিয়া ভিলা; পুনু, মানু, ডোডো, তাতাই, মা, বনা/বেলঘরিয়া; অভি ও মিষ্টি, আকাশ ও রিয়া চক্রবর্তী/পল্লীশ্রী; সন্তোষ, দীপ্তি ও ঈশিতা রায়, সৌম্যদীপ, ঋত্বিক, দীপঙ্কর, ঋতম/যদুনাথ উকিল রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি; শ্যামল, তৃপ্তি, সৌরীশ মিশ্র/ শরৎ আবাসন, সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি; বাঁধন, শঙ্খ, ঝিনুক, সানাই, দিদান/কামডহরি, পূর্বপাড়া, গড়িয়া; অনুষ্কা, লক্ষ্মীশ্রী, অজিতেশ, অন্বেষা, প্রিয়া, শিবব্রত, রাঙারানি, নির্মল লাই/ব্লক-এ, গ্রীনপার্ক, লেকটাউন; গোপলু, কস্তুরী, উপাসনা, তানি, শান্তি, জগন, সোনু, বাসবী, শর্যাতি, পুষ্পরেণু দত্ত/ লেকটাউন; জেঠু, অর্কপ্রভ, সায়ক, অগ্নিভ, অবিষা, অন্তরা, অর্পিতা, অনিষা, অঙ্কিতা, অভিজিৎ, সৌম, শ্রেয়া, মিনা, তনুশ্রী, চন্দ্রিমা, পাপিয়া, মিতা, শ্রাবণী, শম্পা/লেকটাউন;

।। **২৪ পরগনা. (উঃ/দঃ)**।। ফাল্গুনী, সমীর, আশিস, দিলীপ, শমীক, সায়ন মুখোপাধ্যায়, রুনা ও দীপাঞ্জনা মৈত্র/নারায়ণপুর, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল; নীলাঞ্জন, নীলোৎপল, নমিতা, উৎপল দত্ত/ মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক, অশোকনগর;

।। **হাওড়া**।। মৌ, টুসি, লুসি, মণীশ, সোনাপিসি, খুকুপিসি, জয়দীপ, অভীক, অতনু ও দাদু/সুলতানপুর, রামনগর; দিৎসা, অলোক, লিপিকা, জগন্নাথ, মহুয়া, চন্দ্রিমা/চারাবাগান, চ্যাটার্জি হাট; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী, অর্চিতা, শতাব্দী মুখার্জি/ গণেশ চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর; রুমা, দোলা, পূজা, সোনালি ব্যানার্জি, অর্পিতা, নিবেদিতা, রিমা/অনন্তদেব মুখার্জি লেন, শিবপুর; শোভন, সুকান্ত, মৃত্যুঞ্জয়, সৌম্য, সৌরভ, শুভম ব্যানার্জি/ বিনোদ বিহারী হালদার লেন, শিবপুর; ত্রিবিক্রম ও অনিন্দিতা জানা/বিপ্রন্নপাড়া, ডোমজুড়; দিশা, দোদো, অন্বেষা, পুকান, অরুণাভ ও তুহিন গুপ্ত/নবকুমার নন্দী লেন, কালীবাবুর বাজার, চৌধুরীবাগান;

।। **হুগলি**।। প্রশান্ত, দীপান্বিতা, রুদ্র ও অনঘ ঘোষ/তালারপাড়, আরামবাগ; সায়ন, স্বাতী, অপর্ণা, চিত্রা, বলরাম, সুকুমার, বিজয়, অরিন্দম, অলি, রমা, মামণি, মানু/জমিদার রোড, শেওড়াফুলি; ঐশী, দেবাংশি, ঈশানদেব, জলি, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোক মুখার্জি/এস. পি. মুখার্জি সরণি, শ্রীরামপুর; সৌনক, সায়ন্তনী, স্বাগতা, তুষারকান্তি ঘোষ/বরুনানপাড়া; অমল দাস, দিব্যেন্দু ও পূর্ণেন্দু দাস/কয়াপাট, বদনগঞ্জ; দিলীপ কুমার দে ও অরুন্ধতি দে/ এন. সি. ব্যানার্জি রোড, বৈদ্যবাটী; গোলা, পাস্তু, সদু, রাজু, মহারাজ, নেড়ি/জি. টি. রোড, মাহেশ; প্রীতি, দিগন্ত, বিজলী, আশিস কোলে/বড়সরসা, ইটাচুনা;

।। **বর্ধমান**।। সুমেধা, সুশ্বেতা, ঋতুপর্ণ, দেবশ্রুতি, অভিষেক, ছোটন/বার্নপুর; সুতপা, সুদীপ্ত, আলো, বোধিসত্ত্ব দাস ও গদা দে/কাটোয়া, সার্কাস ময়দান; সুনন্দা, ঋতস্মিতা, শুভরূপ চট্টোপাধ্যায়/স্কুলপাড়া, রানিগঞ্জ; মানাই, সোম, দীপ, রিয়া, পাপিয়া, শিউলি রায়/গির্জাপাড়া, শ্রীকৃষ্ণপল্লী, রানিগঞ্জ; ডোডন, জিত, দিয়া, রুম্পা, লালী, শিল্পী, বেবি, চিন্টু, বুবু, মতি, দুষ্টু, মিষ্টি ও বুব/আড্ডা কলোনি, দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল; প্রত্যয়, প্রতীক, প্রতীম, কেয়া, পরেশনাথ/নিয়ামতপুর;

।। **মেদিনীপুর (পূঃ/পঃ)**।। গোপলু, বিউ-সিউ-ডিউ, জগন, শান্তি, সোনু, ইতু, পার্নু, খুকু ও পুষ্পরেণু দত্ত/মহিষাদল; সুশোভন, অপরাজিতা ও নবনীতা/কুলটিকরি; রাই, চন্দন, দেবত্রি, অর্চনা ও ছবি/সেখপুরা চার্চ রোড, কপিলাবস্তু; তমাল, তুহিনা, রাখী ও অশোক দে/ভগবানপুর, খড়্গপুর; অঙ্কন দত্ত, রঙ্গনা দাস, রচনা দাস/পাটনাবাজার;

।। **বাঁকুড়া**।। মোহিত, সুকান্ত, রেবা, শুভ্রা, শঙ্কু, প্রশান্ত, প্রণব মণ্ডল/শিরপুরা; শিঞ্জিনী ও রিম/নতুনচটি, সারদাপল্লী; সৃষ্টি, সাম্য, আপা ও বড়পিসি/উখড়াডিহি; অংশু ও পূজা মণ্ডল/মটুকবনি, শালতোড়া; বুনু ও দেবলীনা/মনসাতলা, বিষ্ণুপুর; শান্তি, মধুমিতা, ঋজু, প্রেরণা, প্রতীক মণ্ডল/মটুকবনি; তপন, রুশা ও রুদ্রনীল চক্রবর্তী/তিলুড়ি; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জি/ চাতরার মোড়, দাসদীঘি; ডলি, বকুল, দেবিদাস ও দেবতনু ব্যানার্জি/দিগপাড়; কুশল, সবিতা, কার্তিক, কুসুমকুমারী প্রামাণিক/ ব্যাপারীহাট, দুর্গামেলা;

।। **বীরভূম**।। শুভম, অর্ক, যিশু, নেহা, তাতাই, ঋক, মিমি, ধীরেন চ্যাটার্জি/আমোদপুর; কুটুভাই, কুলনা, ঝিলম, যমুনা ও দীপ দত্ত/কলেজপল্লী, বোলপুর;

।। **নদীয়া**।। ভারতী সিনহা, কৃপানাথ সিনহা/কল্যাণী; শঙ্কু, লিপি, ঝিলিক, ঝিলম, দেব, দেবায়ন, দাদাই, দিদা, পি, বাঘা ও পখিরা/গোবিন্দনগর, মদনপুর; অঞ্জলি বাগচি, ব্রততী ও অর্ঘ চৌধুরী/মদনপুর; তামান্না খাতুন/কানাইনগর;

।। **আলিপুরদুয়ার**।। সমর, বুলা দে/আলিপুরদুয়ার, রাজতৃপ্তি হাউসিং;

।। **উত্তর দিনাজপুর**।। বাবা, মা, মিলু, তাতাই ও মিতু/ সুকান্তপল্লী, ডালখোলা;

।। **ঝাড়খণ্ড**।। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য/হিনু, রাঁচি; প্রণব, গীতা, সৌম্য, ইভা, শেলী, বুলি, বনা, টাবু, ডোনা, ডোডো, তিতিন সেনগুপ্ত, চিত্রলেখা, আশিস, অঙ্কন দাশগুপ্ত/বাগুননগর, বারিডি, জামসেদপুর; চুমকি, জয়শ্রী, রীনা, লক্ষ্মণ, সন্দীপ, ডল, দীপ, রুবেন ও নিরঞ্জন করগুপ্ত/কদমা, জামশেদপুর; সৌরেন, সুকন্যা, শৌভিক, শুভম ঘোষ রায়/মৌভাণ্ডার, পূর্ব সিংভূম;

।। **দিল্লি**।। ফচকে, জিষ্ণু, ঋজু, অঞ্জনা, জগন, অরিজিৎ/ বসন্তকুঞ্জ;

।। **মহারাষ্ট্র**।। বাণীকণ্ঠ, শুক্লা, শুভদীপ, নবনীতা, প্রেরণা, রূপপর্ণা, সবিতাব্রত, সোহম, দেবকণ্ঠ, সুনন্দা, ঋতুপর্ণা, ইন্দ্রনীল, শ্রেয়পর্ণা, চুনী, কবিতা, অনির্বাণ, দেবার্পণ, দেবাদৃতা, দেবানিকা, দীপ ও রুনা/নাগপুর;

।। **কর্ণাটক**।। সুপর্ণকান্তি দাস, অলিভিয়া বিশ্বাস/ বেঙ্গালুরু।

কুইজ কুইজ

প্রশ্ন

১. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দিরটি কোথায়? কোন দেবতার মন্দির সেটি?
২. ভারতের সব থেকে বড় মন্দির কোনটি? কোথায়?
৩. পৃথিবীতে সব থেকে পুরোনো মন্দির বলে দুটি মন্দির চিহ্নিত। কোথায় সেই মন্দির দুটি?
৪. সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে প্রচীন হিন্দু মন্দির হিসেবে কোন মন্দিরকে মানা হয়?
৫. ২০১৩ সালে কোন দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়?
৬. ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া আর কাকে 'আয়রন লেডি' বলা হয়?
৭. বর্তমান ইংরেজি বছরের প্রথম দিন ছিল মঙ্গলবার, আসছে বছর কী বার হবে?
৮. এ বছর বৃটেনের রাজপরিবারে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে তার নাম কী?
৯. দাদু-দিদাদের দিনের সূচনা কে করেন? তিনি কোথাকার বাসিন্দা?
১০. মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দ্বিতীয় টার্ম কবে শুরু করেন?
১১. অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির তৈরি করতে মোট কতো সোনা লেগেছিল?
১২. ভারতের কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মন্দির আছে?

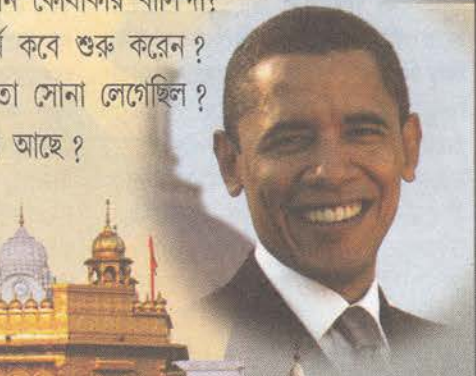

উত্তর ৪২ পৃষ্ঠায়

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

অনার্যদের দেখানো ম্যাজিক

কয়েক মাস আগে আমার লেখায় আমি 'মনুসংহিতা'র উল্লেখ করেছিলাম। তার ১১২ নং শ্লোকটাকে উল্লেখ করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলেছিলাম, বাজে জমিতে যেমন ভালো বীজ পুঁততে নেই, তেমনি বাজে মনের মানুষকে কখনও ম্যাজিকের কৌশল শেখাতে নেই। যাকে-তাকে শেখালে তার ফল সমাজের কাছে অমঙ্গলের হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলছি, কিছু কিছু কুমতলবী লোক আছে যারা কিছু ম্যাজিকের কৌশল শিখে, সেটাকে অলৌকিক শক্তি হিসেবে দেখিয়ে, সহজ-সরল মানুষকে ধোঁকা দিয়ে সাধুবাবা সেজে ব্যবসা চালাচ্ছে। সেরকম কুমতলবী মানুষকে ম্যাজিক শেখানোই উচিত নয়। সব্বাই কথাটাকে মেনে বলেছেন, সত্যিই তাই, অ-পাত্রে যেন দান না করা হয়। কিন্তু এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ তাতে খুশি হননি। না, না, সাধুবাবাদের সাপোর্ট করে তাঁরা রব তোলেননি; তাঁরা হৈচৈ শুরু করেছেন আমি 'মনুসংহিতা' বইটার নাম কেন উল্লেখ করেছি। আমি নাকি ধর্মান্ধ এবং তাঁদের সুস্থ-সমাজকে অসুস্থ করছি।

সত্যিই আমি ওঁদের এই আচরণে অবাক হয়েছি। শুধু আমি নই আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই হয়েছেন অবাক। 'মনুসংহিতা' একটা পুরোনো আমলের গুরুত্বপূর্ণ বই। সমাজকে সাহায্য করতে ঐ আমলের উপযোগী নানারকম উপদেশ দেওয়া আছে। বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে গেছে—সুতরাং সেই উপদেশের অনেকগুলোই আজ হয়ে গেছে হালকা। এভাবেই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পাল্টাচ্ছে, পাল্টাবে। আইন-কানুন, অসুখের ওষুধ, উপার্জনের উপায় থেকে শুরু করে বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা, বাজার মোবাইল, কমপিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা, টিভির মাধ্যমে সংবাদ শোনা-দেখা-বিশ্লেষণ করা সবই পাল্টে গেছে। সেটাই তো হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু তাই বলে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা বা গুরুজনেরা যা-যা বলে গেছেন তার সবই এলেবেলে, বাজে কথা, এটা বলা বা ভাবা ঠিক নয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যদি বলেন—বিদেশের পণ্ডিতেরাই ঠিক ঠিক বলেছেন—ওঁদের আদর্শ, মতামত, দেখানো পথ, সেটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেটা ভাবাও ঠিক নয়। সাহেবরা শীতকালে কোট-প্যান্ট-ওভার কোট পরে—সুতরাং আমাদেরও পরতে হবে কোট-প্যান্ট-ওভার কোট; অথবা বিদেশে ঘোড়া দিয়ে চাষ করা হয় সুতরাং আমাদের দেশেও বলদের বদলে ঘোড়া দিয়ে লাঙল টানতে হবে; ওদের দেশে সবজি হিসেবে বাঁধাকপি আর আলু গজায়—সুতরাং আমাদের দেশেও শুধু বাঁধাকপি আর আলুর চাষ করতে হবে...ওরা খায় পাউরুটি, সুতরাং আমাদেরও ভাতের বদলে পাউরুটি খেতে হবে। এই মতামতকে তারা উন্নতির পথ বলে ভাবলেও, আমি ভাবতে রাজি নই। যেখানে যা সেখানে তা। সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। মনুসংহিতার সবকিছুই যে খারাপ তা মোটেই নয়। কিন্তু সমাজ-গঠনের দিক দিয়ে, সেই পুরোনো দিনে মানুষ যখন দিশেহারা তখন ঋষি মনু জীবনে সুখে থাকার জন্য এই বইটা লিখেছিলেন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেজন্য আমি গর্ব বোধ করি। বিদেশে তখন কেউ সে আমলে এমন বই লিখতে পারেননি। আমার অন্তত জানা নেই। সময়ের তালে তালে তাতে তো অদলবদল কিছু ঘটবেই। কিন্তু তাই বলে মনুসংহিতার প্রয়াসকে আমি অশ্রদ্ধা করব—তা হতে পারে না। ওদের এই বিদেশিদের খুশি করার কাজটাকে আমি এক কু-প্রয়াস বলে মনে করি। ভারতীয় হিসেবে আমি আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন নিয়ে খুবই গর্বিত। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা-গুরুজনেদের দেওয়া শিক্ষাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁদের দেওয়া শিক্ষার ওপর

ভর করেই আমি নতুন শিক্ষা, নতুন বিজ্ঞান রচনা করি। সুতরাং সদর্পে বলছি—যা বলেছি, বেশ করেছি। আমি বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে বলব আমাদের দেশের মুনি-ঋষিদের কথা। আমি তাঁদের প্রণাম জানাই। তাঁরা আমাদের সভ্যতার ভিত। তাঁদের দেওয়া শিক্ষার ওপরেই ভর করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সব কিছু।

আজকে তোমাদের যে ম্যাজিকটা শেখাব—সেটা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক কিছু একটা বলে মনে হলেও এর কৌশলটা খুবই সহজ এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক। ম্যাজিকের পুরো ব্যাপারটাই তাই। প্রতিটি ম্যাজিকই মানুষকে অবাক করার ক্ষমতা রাখে। এর মধ্যে যদি ম্যাজিকের কৌশলটা বা বিজ্ঞান অংশটা জানা না থাকে তো তাহলে সেটা হয়ে থাকে অলৌকিক। কিন্তু যদি কৌশলটা জেনে ফেলা যায় তাহলে সেটাই হবে বিজ্ঞানের খেলা, বুদ্ধির মারপ্যাঁচের কারসাজি। পুরোনো আমলে তো সবাই আর আজকের মতো ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়া ছিলেন না। সেজন্য তখন এই আজকের অনেক কিছুই ছিল ম্যাজিকের মতো। আজকের বিজ্ঞান ছিল বিগত দিনের ম্যাজিক। ঠিক একই হিসেবে আজকের 'ম্যাজিক' হয়ে যাবে আগামীদিনের বিজ্ঞান। তবে হ্যাঁ, আজকে যদি কেউ একটু কয়েক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করেন—তাহলে তাঁকে আমরা বলি গপ্পো করছেন, কল্পনা করে বানিয়ে বলছেন। ঠিক তেমনই ঐ পুরোনো আমলে যাঁরা সে আমলের মানুষদের চেয়ে দু-কদম এগিয়ে ছিলেন—তাঁদেরকেও আমরা তখন ভেবেছিলাম গল্প করছেন, কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্য করছেন। কিন্তু এতদিন পরে তাঁদের সেসব কথাগুলো যখন বাস্তবে ঘটতে দেখছি, তখন বুঝতে পারছি, তাঁরা কত এগিয়ে ছিলেন। কত বিজ্ঞানীকে আমরা ভুল বুঝে শাস্তি দিয়েছি, অপমান করেছি। ইতিহাসে সে-সব কথা বার বার দেখতে পেয়েছি। নিজেদের অজ্ঞতা বা নৃশংসতাটা ঢাকবার জন্য অনেক সময় বাজে চেহারায় উপস্থাপন করে ঐ সমস্ত এগিয়ে থাকা মানুষগুলোকে রাক্ষস-খোক্কস বানিয়েছি।

আমরা ভারতে আসবার আগে

আমাদের দেশ ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার দেশ। তাঁরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেতনায় আর্যদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। আর্যরা ছিলেন মূলত যাযাবর শ্রেণির মানুষ। ভারতে এসে বা আসবার পথে নানারকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করেন। নানারকম পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে এই সভ্যতা। তারই নাম হল হিন্দু সভ্যতা। আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের ঐ নতুন দেখা চেতনাকে ভেবেছিলেন— অলৌকিক ক্ষমতা। আজ তোমাদের আমি এমন একটা ম্যাজিক শেখাবো যা নাকি আর্যরা এসে অনার্যদের কাছে মানে দ্রাবিড়দের কাছে প্রথম দেখেন এবং অলৌকিক ক্ষমতা ভেবে বেশ সমীহ করে চলেন। পরবর্তীকালে সব মিলেমিশে গেলে সেই অলৌকিক ক্ষমতাটাকে ফেললেন শিখে। হয়ে গেল বিজ্ঞান। আগেই বলেছি কৌশলটা জেনে ফেলে যে কোনও 'ম্যাজিক' বিজ্ঞানে পরিণত হয়। যাই হোক, ম্যাজিকটা প্রথম থেকেই বলছি।

জাদুকরের কাছে এক পাত্রভর্তি পরিষ্কার জল রয়েছে। জাদুকর দর্শকদের যে কেউ একজনকে বললেন, ওতে হাত চুবিয়ে ভিজিয়ে নিতে। একজন এসে জলে হাত চোবালেন আর তারপর হাত তুলতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা গেল হাত গেছে ভিজে। মানে যা হওয়া উচিত ঠিক তাই-ই হয়েছে। এবার জাদুকর তাঁর হাতে রাখা একটা কৌটো থেকে কিছু মন্ত্রপূত ছাই নিয়ে ঐ জলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে অন্য একজন দর্শকের হাত চোবালেন এবং একটু পরেই তুলে আনলেন। অবাক ব্যাপার! তাঁর হাত রয়েছে শুকনো খটখটে।

এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক এক ভারতীয় ম্যাজিক। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদে লেখা নেই—তবে বংশ-পারম্পরিক পারিবারিক গুপ্তবিদ্যা হিসেবে জাদুকর পরিবারে মন্ত্র-গুপ্তির মতো চুপচাপ বেঁচে আছে। এমন গোপন বিদ্যা এখনও আছে হাজারে হাজারে। আজকে তোমাদের আমি তার থেকেই একটা শিখিয়ে দিচ্ছি। ঐ মন্ত্রপূত ছাইতে মোটেই কোনও মন্ত্র-টন্ত্র নেই। এটা সম্পূর্ণ ফিজিক্স-এর ব্যাপার। ফুলরেণু ভস্ম নামে একটা বিশেষ আয়ুর্বেদিক পাউডার সংগ্রহ করতে হবে। ওটা না পেলে যে কোনও হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান থেকে 'লাইকোপোডিয়াম ডাস্ট' কিনে নাও। ঐ লাইকোপোডিয়াম ডাস্ট জলের ওপর ছিটিয়ে দিলে ওটা ঠিক সরের মতো একটা আস্তরণ হিসেবে ভেসে থাকবে। জলে হাত চুবোলে ঐ লাইকোপোডিয়াম ডাস্ট হাতের সঙ্গে লেগে থাকবে, সঙ্গে থাকবে অদৃশ্যরকম হাওয়ার মিহি বিন্দু। জল সেটাকে ভেদ করে ত্বকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং হাত ওঠালেও দেখা যাবে সেটা রয়েছে শুকনো। আশা করি বুঝতে পেরেছ। বন্ধুদের দেখিও, তবে খবরদার 'মন্ত্রশক্তি'-টক্তি বলে এটাকে উপস্থাপন করো না। সেটা হয়ে যাবে মিথ্যাচারিতা। বলবে— একটা গোপন বিজ্ঞান-ভিত্তিক ম্যাজিক তুমি জানো—যা দেখে আর্যরাও অনার্যদের ভয় পেয়েছিল।

—

ছবি : গৌতম দাশগুপ্ত

তোমাদের পাতা

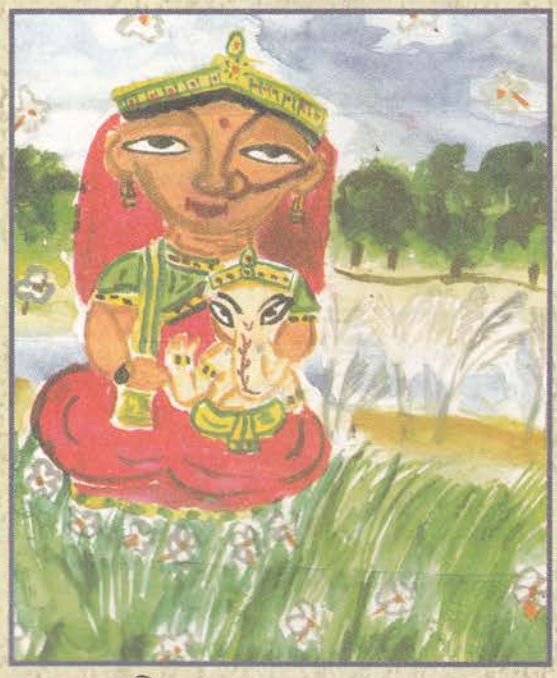

কোজাগরী ঘোষ, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণি
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন
বালিগঞ্জ, কলকাতা

আজকের যুগ

ফ্যান পাখা ছেড়ে
এখন হয়েছে এ.সি-র যুগ,
প্রেশার কুকার ইনডাকশনে
হচ্ছে এখন কুক্।
ছোটো-বড়ো সবার হাতে
থাকছে মোবাইল ফোন,
হচ্ছে ফ্ল্যাট বড়ো বড়ো
শেষ হচ্ছে বন।
রিকশা, ট্রলি ছেড়ে
এখন হচ্ছে মারুতি গাড়ি,
নতুন যুগে এত অবক্ষয়
আর কি থাকতে পারি?

কাশ্যপেয় আইচ,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণি,
রামপুরহাট জে. এল. বিদ্যাভবন,
বীরভূম

গ্রামের শরৎ

গ্রামের পথেই কেটে গেছে কত
শরৎকালের বেলা,
কাশবনে হেঁটে দস্যিপনায়
করে গেছি কত খেলা।
ভাদ্রের শেষে হারিয়ে যেতাম
আকাশে ঘুড়ির ভিড়ে,
মা-জেঠিমারা আলপনা দিত
নানা রঙা; ঘরে, ঘরে।
শরতের দিনে ভাদ্রের পরে
ঠিক আশ্বিন মাসে,
এই পথ ধরে উমাও আসত
গ্রামবালিকার বেশে।
শহর এখানে বাড়িয়েছে থাবা,
সেই পথ দূর অস্ত।
উমাও এখন হাই বাজেটের
থিমেতেই অভ্যস্ত।
বছর ফুরোয়, পরিবর্তনে
সকলেই আজ ব্যস্ত।
তবুও শরৎ আজও যায়-আসে,
আগে সে যেমন আসত।

সন্দিপনা ধর,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণি,
মালাজং সেহেড়াকুড়ি বংশীধর
উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম

রোমিত বিশ্বাস, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণি
পান্নালাল ইনস্টিটিউশন
কল্যাণী, নদীয়া

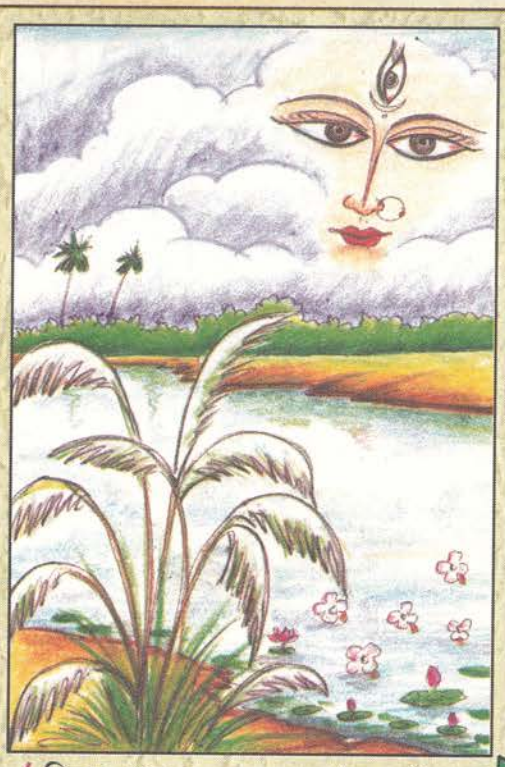

ঝিনুক দাস, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণি
বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতন
পশ্চিম মেদিনীপুর

ভূত মতো

রাত নিঝ্‌ঝুম
চোখে নাই ঘুম।
ঘুম ঘুম চোখ
দেখি কালো লোক।
লোক ও তো নয়
লাগে তাই ভয়।
ভয়ে ছমছম
ঠিক যেন যম।
যম কেন দোরে
ডাকে নাকি সুরে।
সুরে উঠে মায়া
ভাসে শুধু ছায়া।
ছায়া ছায়া কায়
ভূত মতো প্রায়।

মোনম আচার্য,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণি,
কাশীপুর স্কুল, ধতলা, পুরুলিয়া

সুন্দরবন

আমি গিয়েছিলাম সুন্দরবন—
সেখানে খালি গাছ আর বন।
সেখানে কত পশু আছে!
নতুন নতুন পাখি বসেছে গাছে গাছে।

সেগুলো দেখলে মন ভরে যায়,
বল তো দেখি ওরা কি খায়?
কী সুন্দর সে দৃশ্য!
কিন্তু সেখানে এতটুকুও নেই শস্য।

সেখানে কি মানুষ থাকে?
থাকতেও পারে পথের বাঁকে।
কী করে যে থাকে বাবা!
বাঘ যদি দেয় বসিয়ে থাবা।

শামিয়া খাতুন,
বয়স ছয়, কেজি থ্রি,
পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ
সেবাশ্রম বিদ্যানিকেতন,
পূর্ব মেদিনীপুর

সোহিনী পাকড়াশী, বয়স সাত, তৃতীয় শ্রেণি
জি.ডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন
ঢাকুরিয়া, কলকাতা

হাঁদা-ভোঁদার
ভূতে কাহিনী
সাম্প্রতিক বন্যায় পশ্চিম পাড়ার শেষে নির্জন পরিত্যক্ত পুকুরটায় বেশ কিছু মাছ ঢুকেছে। হাত ছিপ ফেলে দেখি যদি কিছু মাছ মেলে।
মাছ ধরতে যাচ্ছেন, পিসেমশাই?
পশ্চিম পাড়ার ঐ এঁদো পুকুরটায় মনে হয় মাছ আছে। দেখি যদি ধরতে পারি।
পরে তোরা একটা ব্যাগ নিয়ে পুকুরপাড়ে আয়।
ঠিক আছে, পিসে মশাই।
বন্যার সুবাদে দেখছি জলের সঙ্গে ভেসে আসা অনেক মাছ জল সরে গেলেও এই পুকুরটায় বেশ কিছু রয়ে গেছে।
ছিপ ফেলতে না ফেলতেই একটা ধরা পড়েছে।
পর পর মাছ ধরা পড়ছে। মাছগুলো আমার পেছনে রাখি, ওরা এসে তুলবে। দেখি যদি আর কয়েকটা ধরতে পারি।
এদিকে-
আঃ! কাঁচা মাছের গন্ধ পাচ্ছি যেন! কাছেই মনে হচ্ছে!

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক এ. টি. দেব প্রাইভেট লিঃ, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত ও ২২/৪ সি ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

বাঙালি ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখার নিত্যসঙ্গী

A. T. Dev-এর নতুন অভিধান

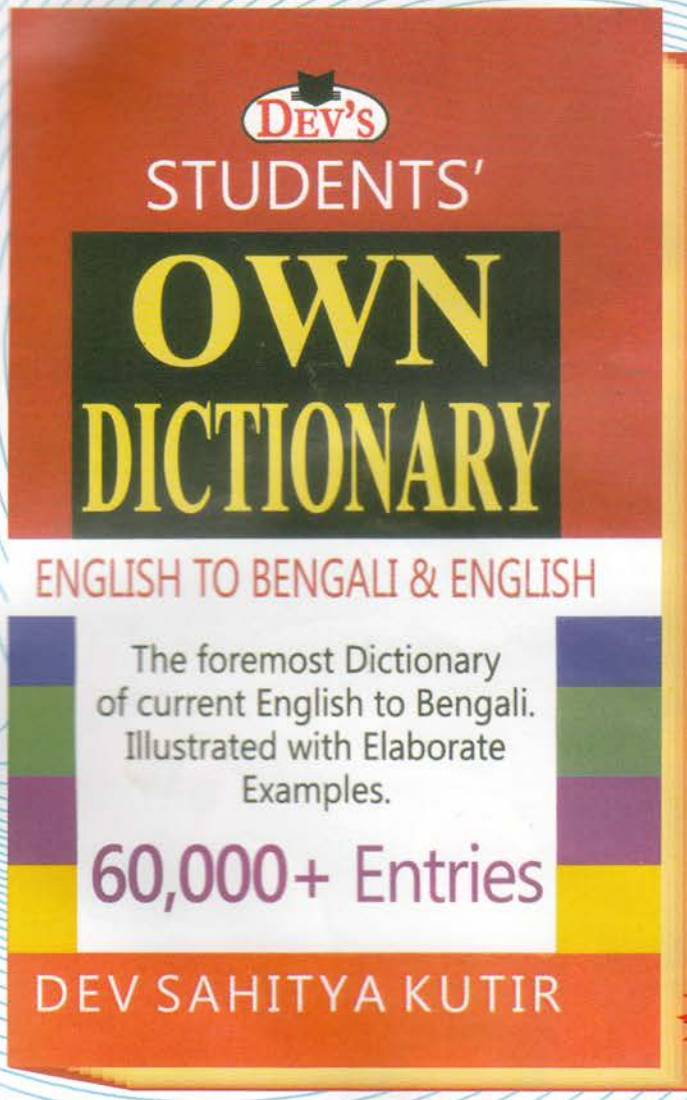

Rs.460/-

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ফোন - ২৩৫০ ৪২৯৪ / ৪২৯৫ / ৭৮৮৭ | e-mail : dev_sahitya@rediffmail.com

October "Suktara".PUB. ON 1.10.14 Registration No./Kol/RMS./187/2013-15